গল্পের বই

বিকাশ গ্রন্থ-ভবন
৩৭/৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬৪

প্রকাশ করেছেন
ভারতী আচার্য ও ব্রতী আচার্য
৩৭/৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ণ সংস্থাপন করেছেন :
আই. ই. আর. ই
২০৯এ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ছেপেছেন :
স্বপন কুমার দে
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা : ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল

বুব্‌লাইকে

মেঘমল্লার

মেঘের মতন সেই ছেলে। শ্রাবণ মেঘ। অমনি গায়ের রং। ঘন নীল। সমস্ত মুখে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর তার দিকে তাকিয়েছি কি তাকাইনি, গুরু গুরু শব্দ উঠে এল আমারই বুকের ভেতর থেকে। বাজ পড়বে, পড়বেই। বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত হাসি এসে ফালাফালা করে দিল বুক।

—'মা! এবার আমি কোথায় পালাই?'

—'দু দিন একা থাকলেই হাঁপিয়ে উঠিস, হ্যাঁরে! অর্জুনের সঙ্গে কী কাণ্ডই না করলি। সবাই বারণ করলাম, তাও তুই ঝাঁপালি পাগলের মত। ওভাবে কি কিছু হয়! হল কি কিছু? হয়নি, মিটে গেছে। এরই মধ্যে আবার শুরু ছটফটানি?'

—'শুধু তোমাকেই বললাম। তাকে তো বলিনি কিছু। আমি কি ইচ্ছে করে করি, মা! দেখছ না, পালাতে চাইছি?'

মা বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

—'বুঝি না তোমার কাণ্ড বাপু। কিসেরই বা ফাঁদ, কিসের থেকে পালানো! কোথাও বেরোবি না এ ক'দিন। ঘরে বসে লেখার চেষ্টা দ্যাখ।'

মা আর বসেন না। ছাদে চলে যান। গাছে জল দিতে হবে। আমি লেখার টেবিলে বসি। লেখা হবে না এখন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই। পশ্চিম আকাশ জুড়ে থরে থরে তার মুখ। ঝড় উঠবে উঠবে করেও ওঠেনি অনেকদিন। বড্ড গরম আর গুমোট গেছে গত কয়েকদিন ধরে। আজ কালবৈশাখী হবে, আমার মন বলছে।

কালবৈশাখী এল। শিরাময় ঝনঝন শব্দ তুলে ধেয়ে এল ঝড়। ছুটে এসে টেলিফোন ধরলাম, ও প্রান্তে তারই স্বর। আমি জানতাম। খোলা জানলা দিয়ে ঝড় ঢুকে পড়েছে ভেতরে। ধুলোয় ধুলো হয়ে যাচ্ছে ঘর। টেবিলঢাকা উল্টে গিয়ে ঝাপটা লাগল ফুলদানিতে, মেঝেতে ছড়িয়ে গেল শুকিয়ে আসা করবীর ডাঁটি। আমরা গল্প করি। এমনি গল্প। ঝড়ের পাগলামি, বৃষ্টির খুশি। ও হঠাৎই ফোন রেখে দেয়। বলে,

—'সারাদিন রান্না করিনি, জানো! এবার খিদে পাচ্ছে। রান্না করব, এখন ছাড়ছি।'

আহা, সারাদিন খায়নি, কী খারাপ! একা একা থাকে, কী ভাল! বৃষ্টি পড়ে চলেছে সমানে! বুকের মধ্যে জল জমে। অনেকদিন পরের বৃষ্টি। পথঘাট ভাসবে এখন অনেকক্ষণ ধরে। চারপাশ ঝাঁঝালো ঠাণ্ডা। সদ্যখোলা কোল্ডড্রিংক্সের বোতলের মত। মাটির সমস্ত তাপ শুষে নিচ্ছে আকাশ। আমি নৌকো বানাই। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসি। সদর

দরজার নিচে সিঁড়ির প্রথম ধাপ ডুবে গেছে, দ্বিতীয়টি ডুবুডুবু। নৌকো ভাসাই তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে। তার আগে ওই নৌকোর গায়ে ফিসফিস করে লিখে দিই 'মল্লার'। মেঘমল্লারে ভাসতে ভাসতে অথৈ গাঙে গিয়ে পড়ুক আমার নাও। গাঙ পেরিয়ে পৌছুক তার দেশে। যে দেশে নদীর বুকে মেঘ ঝুঁকে থাকে বারোমাস, আর জলো হাওয়া দেয় ঝলকে ঝলকে, বৃষ্টি আসবার ঠিক আগের মুহূর্তটি যেখানে অনন্ত......

ঘরে ফিরে আসি। ক্যাসেট চালাই। মেঘের গান, শ্রাবণের গান। মাকে আর টবের গাছে জল দিতে হয়নি। ঘরে এসে বলেন—

—'ছেলেটার গানের গলাখানি ভারি ভাল, সন্দেহ নেই।'

আমার কেমন শীত করে ওঠে লজ্জায়। কেন, কে জানে!

মল্লার আমাকে গান লিখে দিতে বলেছে। প্রথম আলাপের দিনই। আসলে, এই কারণেই ও আমাকে ফোন করেছিল একদিন। এমনিতে ও নিজেই গান লেখে, সুর বসায়, গায়। নতুন বাংলা গানের ঝকঝকে তারা। প্রথম থেকেই ওর গান আমায় টানত। ক্যাসেট কিনেছি। দু'একটা অনুষ্ঠানেও গেছি শুনতে। ফোনের কণ্ঠস্বর যেদিন আমায় বলল,

—'হ্যালো, বসুন্ধরা মিত্র আছেন?' আমি বুঝলাম, অচেনা কেউ।

—'হ্যাঁ, বলছি।'

—'নমস্কার। আমার নাম মল্লার দাশগুপ্ত। গান করি।'

—'আরে! কী আশ্চর্য! মল্লার? আপনি? আমায় ফোন করছেন!'

আমার পুলকিত বিস্ময় শুনে মল্লার হেসে ফেলেছিল। বলল

—'আপনার কবিতা পড়ি। কয়েকটা বেশ ভাল লেগেছে।'

—'আমি আপনার গান শুনি। খুব ভাল লাগে। আপনার কথা অপূর্ব, সুর ও কণ্ঠস্বরও।'

—'তাই? কিন্তু আমার নিজের যে মনোমত হয় না! বিশেষ করে কথা। আমি তো কবি নই। তুমি আমায় গান লিখে দাও না?.... এই যাঃ, তুমি বলে ফেললাম। আপনি আসলে আমার থেকে অনেকটাই ছোট...'

—'অনেক ছোট নই। তবে তুমি বললে অসুবিধে নেই কিছু।'

—'বেশ। গান লিখে দেবে?'

সেই গান আমি লিখে দিয়েছি। ওর পছন্দ হয়েছে। সুর এখনও করা হয়নি ওর। মাত্র দিন দশেক তো হয়েছে। এর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। দেখা হয়েছে দুদিন। কথা হয়েছে অনেকবার, টেলিফোনে। মনেমনেও। মনেমনে? সে তো আমি বলেছি। ও-ও কি বলেছে?

কালবৈশাখীর পর পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে এল রাতে। উদ্দাম শরীরী প্রেমের পর যেমন ঘুম নেমে আসে, তেমনি। শ্রান্ত নৈঃশব্দ জমে আছে চারদিকে। আমার ঘুম আসেনি। ফোন

করি।

—'কী রান্না করলেন?'

মল্লার হাহা করে হাসল। মেঘ থেকে মেঘে ছড়িয়ে যাওয়া হাওয়ার মত হাসি।

—'রান্না? তোমার সঙ্গে কথা বলার পর, কিচেনে গিয়ে দেখি কি, চাল নেই, ফুরিয়ে গেছে। মনে ছিল না।'

—'সে কী! কী খেলেন তবে!'

—'কী আবার। চাল ছিল না, আলু ছিল দুতিনটে। আর ট্যাড়স। টমেটোও ছিল একটা। সব সেদ্ধ করে নিলাম। তারপর নুন আর মাখন দিয়ে—ফার্স্টক্লাস!'

—'কোনও মানে হয়! এমন বেখেয়ালি লোক দেখিনি তো আর!'

—'ম্? তাই? সত্যি বলছ? কখনো দেখনি?'

মল্লার ঝুপ করে গলা নামিয়ে ফ্যালে। ঝড়বৃষ্টির পর তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার মত, অকস্মাৎ। আমার আবার শীত করতে থাকে।

—'একদিন বাড়িতে এসো না, অনেকদিন আসনি।' মল্লারের গলা আবার স্বাভাবিক। ও গায়ক, কণ্ঠস্বরের ব্যবহার জানে। মোক্ষম গলা খেলায়। ওঠায় নামায় ভাসিয়ে দেয়, মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাতে জানে। মন ধাঁধিয়ে যায় ওর কণ্ঠস্বরের রঙে। আমি অমন পারি না। ডুবতে ডুবতে বলি,

—'গেলাম তো এই সেদিন।'

—'সে তো অনেকদিন আগে। কাল আসবে? এসো না?'

আমার নিশ্বাস হাবাতে থাকে। এখন আমি জলের তলায়। কোনক্রমে বলি,

—'কাল?'

—'কালই। এসো ঠিক।' একটু থেমে যোগ করে—'তোমাকে দরকার। তুমিই পারবে।'

—'কী?'

—'আছে, একটা কাজ। কাল বলব।'

মল্লার ঝিরঝির করে হাসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, মেঘ ভাঙছে ধারায় ধারায়। আমি ভিজে যাচ্ছি। ফোন রেখে দিয়ে বিছানায় ফিরে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে শুই। এত শীত। তবু নিশ্বাস এমন গরম কেন! আমার বুঝি জ্বর এল...

সকালবেলায় বেরনোর তোড়জোড় দেখে মা অবাক হলেন।

—'এত সকালে বেরোচ্ছিস যে আজ?'

—'মল্লারের বাড়ি যাচ্ছি।'

—'এই সাত সকালে!'

আমি কোনও কথা বলি না। অস্থির হয়ে আছি বলে সেই কোন্ সকালে ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছি। স্নান করেছি। একবার জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে আবার বদলে অন্য

জামাকাপড় পরেছি। ইচ্ছে করে। আমি জানি এত সকালে যাওয়া ভাল দেখায় না। অন্তত দশটা বাজুক। এখন মোটে সাড়ে সাতটা। কিন্তু আমি তৈরি হচ্ছি, হতে থাকছি। কাঁধব্যাগে কবিতার খাতা ভরেছি। ছাতা খুলে আবার মুড়ে ফিতে বেঁধে ব্যাগে ভরেছি, রুমাল ভাঁজ করছি। আর মনে মনে বলছি, এখন মল্লারের কাছে যাচ্ছি। মল্লারের কাছে। ও বলেছে, আমাকে ওর দরকার। কী দরকার? বলেছে কাজ আছে, কী কাজ?

মা স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

—'ঐ, শুরু হয়ে গেল তো! পাগলামি! এবার এই ছোটাছুটি চলতেই থাকবে, কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না, দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকবে না। তারপর আবার একদিন আছাড় খেয়ে পড়বে আর হাত পা ছড়িয়ে কাঁদবে। আমার আর সহ্য হয় না। কবে আর বুঝমান হবি তুই?'

আমি হেসে উঠি। মা আমার বন্ধু। আমার আশ্রয়। আমি মা'র হাত ধরে টেনে রাখি। বলি—

—'...এ আকাশ ভাঙে মাঝে মাঝে
ও আকাশ মেঘে আত্মহারা
সে আকাশে নৌকা খোলা আছে
মা আমি আকাশভরা তারা
মা আমার একদিঘি জল
সারা গ্রাম করে ছলোচ্ছল....'

মা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যান, মুখে অসহায় রাগ আর দুঃখ লেগে রয়েছে দেখতে পাই। তাঁর যে মেয়েকে নিয়ে বড্ড চিন্তা। এ মেয়ে উন্মাদ,—পোড়ামুখী, দু চক্ষের বিষ, ফের তুই প্রেমে পড়েছিস?

মল্লারের দরজায় পৌঁছে কলিংবেলে হাত ছোঁয়ানোর আগে বুকে হাত ছুঁইয়ে বললাম, 'থামো'। ঝড় থামল না। আমি তো যীশু নই, আমার নিজের ঝড়ও তাই আমার কথা শোনে না। দরজা খুলে মল্লার হাসল। নীলাভ বিদ্যুতের মত হাসি। চিরে দেওয়া নয়। আভার মত স্নিগ্ধ। বলল—'এসেছিস; আয়।'

লক্ষ্য করলাম, মল্লার আমায় এই প্রথম তুই বলল। আমি এখনও আপনিতে আটকে আছি। ইচ্ছে করেই আছি। কিন্তু ওর মুখে 'তুই' শুনে আমার চমক লাগল। ভালো লাগা চলকে উঠল নতুন করে। অন্যরকম ভালো লাগা।

ঘরে রঙিন গালচে পাতা। এটা নতুন। আগে দেখিনি। হারমোনিয়ামের ওপর খোলা গীতবিতানের পাতা উড়ছে। মল্লার বসে পড়ে কোলে গিটার তুলে নিল। আমাকে চোখের ইশারায় বসতে বলল। কেমন আনমনে গিটারের তারে আঙুল রাখছিল ও। যেন আদর করছে। মুখে এমন হাসির আভা মাখামাখি কেন? নিচু স্বরে গান গাইছিল। ওর নিজের গান নয়। রবিঠাকুরের গান। 'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার

রমণীয়।'

আমার কান্না পাচ্ছিল। এত সুন্দর ওর কণ্ঠস্বর, এমন গভীর উচ্চারণ, একটা বিহ্বলতা আমাকে অবশ করে ফেলছিল। তখনই ও গান থামাল। নিচু, কোমল, আনমনা স্বরে বলল

—'কেন তোকে ডেকেছি জানিস?'

আমি চোখ তুলে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। চোখ নামিয়ে নিলাম। মল্লার কি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে? আরও রহস্যময়, অপরূপ?

—'আমাকে একটা ব্যাপারে একটু হেল্প করতে হবে। এটা তুই-ই পারিস।'

আমি অপেক্ষা করছিলাম।

—'তোর লেখার হাত এমন, তুই ছাড়া অন্য কেউ করলে আমার পছন্দ হবে না। নিজে করলেও নয়।'

—'কী লেখা? গান?'

—'না, একটা কার্ড।'

—'কার্ড?'

—'হ্যাঁ, আমার বিয়ের কার্ড। জানিস, আমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের বিয়ের কার্ড আমি লিখে দিয়েছি এতদিন। আর নিজেরটাই পারছি না। আসলে, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তো! এটা কিন্তু তোকে লিখে দিতেই হবে।'

আমি মল্লারের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাকিয়েই ছিলাম। ঐ মুখে মেঘভাঙা রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে। আমার চোখে লাগছে, খুব লাগছে। তবু চোখ সরালাম না। হাসতে হাসতে বললাম—

—'ও মা! আপনার বিয়ে? কবে? এতদিন বলেননি কেন? আমি নিশ্চয়ই কার্ড লিখে দেব।'

মল্লার ঝলমল করে উঠল। মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেছে। কী নীল আকাশ, পরিষ্কার, স্বচ্ছ। বলল—

—'জানতাম তুই দিবি। আসলে আমি আর বৃষ্টি দুজনেই চাই বিয়েটা একটু অন্যরকম ভাবে করতে। কোনও আড়ম্বর নয়, ধর্মাচরণ ইত্যাদি নয়, উপহার নয়। শুধু প্রিয়জনেরা একসঙ্গে মিলে একটা আনন্দিত সময় গড়ে তোলা, যাতে আমাদের মিলিত জীবনযাত্রার শুরুটা স্মরণীয় হয়ে থাকে। কার্ডের লেখাটাও তাই প্রচলিত রীতির বাইরে বেশ সুন্দর আর অভিনব হোক তাই চাইছি...'

মল্লার আরও কিছু বলছিল। আমি ভাবছিলাম, সেই মেয়েটির নাম বৃষ্টি! বাঃ, কী অসাধারণ। এই মেয়েটিই যে মল্লারের ঠিকঠাক সঙ্গিনী, সে বিষয়ে আমার ঐ মুহূর্তেই কোনও সন্দেহ থাকল না।

মল্লার অনেক কথা বলেছিল। ওর কথা, বৃষ্টির কথা, আমি শুনছিলাম। শুনতে

ভাল লাগছিল। শান্ত দুঃখের মত ভাল। মল্লার অনেক গান শুনিয়েছিল। আমি কবিতা। এই করতে করতে দেড়টা বাজল। আমি মধ্যে দুবার উঠি উঠি করেছি। মল্লার উঠতে দিচ্ছিল না। বলছিল,—'আরও একটু থাক। আর একটু কবিতা শোনা। কী করে লিখিস বলতো! আমি তো পারি না। আমি না, তোকে হিংসে করি।'

—'আহা! আর আপনি যে অমন গান করেন? লেখেনও তো ভীষণ ভালো। কত ভক্ত আপনার!'

—'বোস্। এখন যাস না। আজ সকালে চাল নিয়ে এসেছি, বাজারও করেছি, রান্না করব। খেয়ে যাবি।'

—'না, এখনই বাড়ি যাব। মা ভাবছে।'

—'ফোন করে দে।'

—'না, মা রান্না করেছে। বাড়িতে না খেলে রাগ করবে। আমি যাই।'

মল্লার কিছুতেই শুনতে চাইছিল না। ওর কণ্ঠে প্রথম আন্তরিক মিনতি, পরে হতাশা ঝরে পড়ছিল। কেন এত চাইছিল সে, যে আমি থাকি! আমি দ্বিধায় পড়ছিলাম। কিন্তু, না। আমায় ফিরতে হবে।

উঠে পড়লাম। বললাম—'কার্ডটা লিখে ফেলব তাড়াতাড়ি। ফোনে শোনাব, কেমন? আপনি বলবেন, পছন্দ হয়েছে কি না। না হলে, আবার লেখা যাবে।'

মল্লার একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর মুখে আবার কি ছায়া নেমে আসছে? অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে নাকি? এতক্ষণে ওর রোদ্দুর আমি অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে চাইছিলাম। পারছিলামও। ভেতরে ভেতরে পুড়ছিলাম হয়ত, কিন্তু চোখ আমার খোলাই ছিল। উপরে উপরে বেশ সহজভাবে রোদ্দুর দেখেছি আমি এতক্ষণ। আবার মেঘ দেখে প্রাণ কেঁপে উঠল। এবার কী হবে? কিচ্ছু করার নেই, এই বেলা পালাও মেয়ে! নইলে মরবে!

আমি বুঝতে পারছি বুকের মধ্যে হৃদয় ভঙ্গুর হয়ে রয়েছে। এমন ভঙ্গুর, আঙুল ছোঁয়ালেই হুড়মুড় করে ভাঙবে। আমি চাই না তা। দরজার দিকে ফিরে লকের হাতলে হাত রাখলাম। মল্লার উঠে এসেছে। আমার খুব কাছে, বাঁ-পাশে, সামান্য পিছনে দাঁড়িয়েছে এসে। আমার সারা অস্তিত্বের সমস্ত বিন্দুতে বিন্দুতে ওকে অনুভব করতে পারছি। এত কাছে এর আগে কখনো এসে দাঁড়ায়নি ও। কী এক বনজ গন্ধ, মধুর ঝাঁঝালো, উঠে আসছে ওর শরীর থেকে। আমি প্রাণপণে নিজেকে বললাম, 'পালাও। অবশ হয়ে পড়ার আগে পা তোল, এগোও, দরজা খুলে ফ্যালো।'

দরজা খুলে ফেললাম। মল্লার বলল—'একটু দাঁড়া।' ওর স্বরে ম্যাজিক ছিল। দাঁড়িয়ে গেলাম। দরজাটা চার ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। মল্লার আরও একটু কাছে এগিয়ে এল। ভাবলাম, চোখ বুজে ফেলি। দেখি, ওর মাথা ঝুঁকে এসেছে আমার সামনে। আমি ঝাঁকড়া এলোমেলো রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা দেখতে পাচ্ছি। ও মাথা নুইয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বলল,—'আমার মাথায় একটু ফুঁ দিয়ে দিবি! যদি তোর মত লিখতে

পারি!' আমি ভাঙনের শেষ মুখে এসে ভেঙে ভেঙে হাসলাম। টুকরো টুকরো হাসি। হাসতে এত বুক ফেটে যাচ্ছিল যে কথা বলার জন্য এতটুকুও হাওয়া ছিল না বুকে। মল্লার আবার বলল, গভীর স্বরে, ধীরে ধীরে,

—'দে না রে। একটু ফুঁ দিয়ে দে না আমার মাথায়।'

আমার চোখের সামনে মেঘ ভাসছে, মেঘ কাঁপছে। এ মেঘ আমার বড় মনের মতন, মন কেমন করা। এ মেঘ এমন নিচু হয়ে ঝুঁকে এসেছে যে এবার আমি হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতে পারি। ছুঁলেই ও ঝরবে। আমি জানি। আমি ওকে ঝরালাম না। ওকে আকাশে ফিরিয়ে দিলাম। মাথা নেড়ে বললাম—

—'কী করে ফুঁ দেব? আপনি খুব উঁচু, আমি পৌঁছতে পারছি না।'

দরজা খুলে নামতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। বাঁকের মুখে একবার তাকিয়ে দেখলাম, দরজায় মেঘ ভেসে আছে। শ্রাবণ মেঘ। আমার মনোমত মেঘ। তাকে আমি অমনই রেখে ফিরে এলাম। মেঘ ছুঁলেই জল ঝরে গিয়ে রোদ উঠবে। ঐ রোদ্দুর আমার পছন্দ নয়। আর সে রোদ্দুর আমার জন্যেও তো নয়, আমি জানি।

আমি শুধু মনে রাখব মল্লার আমার জন্যে মেঘ হয়েছিল।

ঋণ. 'মা ও মেয়েটি'—জয় গোস্বামী (পাগলী, তোমার সঙ্গে)

একটি আধুনিক প্রেমের গল্প

মণীশ বদলে গেছে।

কথাটা প্রথম বলেছিল তৃণা। রবীন্দ্রসদন থেকে বেরিয়ে ওরা চা খাচ্ছিল অ্যাকাদেমি অব ফাইন আর্টসের সামনের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে। মণীশ চা খায়নি। কাজ আছে বলে মেসে ফিরে গেল তাড়াতাড়ি। ও প্রচ্ছদশিল্পী। পরিচিতি আছে, সবে নাম করতে শুরু করেছে। বলল, পিনাকী ঠাকুরের প্রচ্ছদটা কালকের মধ্যে দিতেই হবে।

মণীশ চলে যাওয়ার পর তৃণার খেয়াল পড়ল আজ সারা বিকেল আর অনেকখানি সন্ধে সে মণীশকে একবারও বকেনি, তাড়া লাগায়নি। এমনকি, যে কথাটা সে বিশেষত মণীশকেই প্রায়ই বলে থাকে বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্রয় মিশিয়ে,—'পিছনে লাথি মারব, শালা', সেটাও আজ বলা হয়নি একবারও।

চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে তৃণার কথার উত্তর দিল দেবাশিস।

—আমারও কেমন মনে হচ্ছিল। কেন বল তো!

—কিরকম চুপচাপ ছিল না সারা সময়টা? অ্যাকচুয়ালি, ও সঙ্গে থাকলে তো জ্বালিয়ে মারে! আজ ওর উপস্থিতিটা বোঝাই যায়নি। একবারও 'চা খাব' 'সিগারেট কিনে দে'—বলে বায়না করল না—

—হিসি করতে যায় তো চোদ্দবার, তাও আবার ঘোষণা করে। আজ সেটাও যায়নি।

সম্মিলিত হাসিতে কথাটা ঐখানেই চাপা পড়ে গেল। চা খাওয়ার পরে নন্দন চত্বর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা শ্যামলের বাড়ি গিয়েছিল। শ্যামল নতুন কয়েকটা গান বেঁধেছে। গিটারটা খুবই ভালো বাজায়। গান শোনার পর কবিতা। কবিতার পর আড্ডা। সবাই-ই নিশ্চয়ই মণীশকে মিস্ করছে, তৃণা দু'বার ভেবেছিল। এই দু'বার তৃণার নিজের মনে হয়েছিল ঘুরেফিরে যে, মণীশ কেমন বদলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন ঘটনাটা ঘটেছে বেশ কয়েকদিন হল, আজ খুব বুঝতে পারা যাচ্ছিল। দু'বারই তৃণা গান ও কবিতায় মনটাকে ফেরত আনতে আনতে ভেবেছিল, মণীশের কী হয়েছে সেটা ওকে জিজ্ঞেস করা দরকার।

আড্ডাটা আজ একটু বেশিই হয়ে গেছে। বাড়ির দরজার সামনে এসে ঘড়ি দেখল তৃণা, দশটা সাতচল্লিশ। নতুন কিছু নয় অবশ্য। কিন্তু আরেকটু আগে বাড়িতে ঢোকা দরকার ছিল। কাল সকালে 'মনন' পত্রিকা থেকে একটি ছেলে আসার কথা, লেখা নিতে।

লেখাটা তৈরিই আছে। কিন্তু যে-কোনো গদ্যলেখা দ্বিতীয়বার কপি করা তৃণার বাতিক। কপি করতে করতেই সে অনেক সংশোধন ঢুকিয়ে দিতে পারে। আজ রাত্তিরে সেটাই তার করবার কথা ছিল। ছেলেটি যদিও দশটা নাগাদ আসবে বলেছে, তৃণা ন'টা সাড়ে ন'টার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠে না।

বেশ নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকল তৃণা। মা-বাবার চিরদিন সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ার অভ্যাস। ছেলেমেয়েরা লায়েক হওয়ার পর তাদের স্বাধীন চলাফেরায় ওঁরা হস্তক্ষেপ করতে চাননি, যদিও প্রচ্ছন্ন পারিবারিক বন্ধন এবং সে কারণে চোরা শাসন একটা আছে। তৃণা জানে, রাত এগারোটা না বাজালে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। মা খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। তৃণা জামাকাপড় বদলে খাবারটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখল। শ্যামলের বউ অনামিকা আজ প্রচুর মুড়ি-বেগুনি খাইয়ে দিয়েছে।

মা'র ঘরে চুপি চুপি একবার ঢুকল তৃণা। ড্রেসিং টেব্‌ল থেকে অমৃতাঞ্জনের শিশিটা নিতে। লেখাটা নিয়ে বসতে হবে। তার জন্যে মাথাটা একটু ছাড়ানো দরকার। মাথা যে ধরেছে তা নয়, এটা একটা নেশা। কলেজ লাইফ থেকে। কপাল, চোখের পাতা, নাকের ওপর, এমনকি ঘাড়েও দলা দলা অমৃতাঞ্জন ঘষে থাকে তৃণা, বিভিন্ন প্রয়োজনে— ঘুম তাড়ানো, ঘুম আনা, মনঃসংযোগ, ডিপ্রেশান কাটানো ইত্যাদি।

রাস্তার নিয়নবাতির আভায় মায়ের ঘরটা আবছা আলোময় হয়ে থাকে। তৃণা দেখল, মা হাতপাখা নাড়ছেন, ঘুমোননি। তৃণা যে ফিরেছে, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। অমৃতাঞ্জনের শিশিটা হাতড়াতে গিয়ে ক্রিমলোশনের শিশিবোতলগুলো নড়েচড়ে আওয়াজ করে উঠল। মা পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, আর একটু তাড়াতাড়ি কি ফিরতে পার না তিন্নি। খাবারটাও তো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখলি। ফোনটা তোর ঘরে নিয়ে যা। প্রীতি মলয় আর মণীশ ফোন করেছিল। আর তোর টেবিলে দ্যাখ্‌ গে বোধহয় চিঠি আছে, তোর বাবা নিয়ে এসছে নিচের থেকে।

তৃণা চুপচাপ কথাগুলো শুনে অমৃতাঞ্জন আর কর্ডলেস ফোনটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রীতি ফোন করেছিল অনেকদিন পর। ওকে একটা রিংব্যাক করা দরকার। মলয় নিশ্চই লেখা চায়। কিন্তু মণীশ? কখন ফোন করেছিল! এত রাত্রে এসে মাকে বেশি কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু ও তো একবারও বলল না ফোনের কথা। তবে কি দিনের বেলা নয়, সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর করেছিল? মণীশ তো জানে তৃণার ফিরতে দেরিই হবে। আর দশটা সাড়ে-দশটার পরে বাড়িতে ফোন কবতে তৃণা বন্ধুদের বারণই করে রেখেছে, মা বাবা শুয়ে পড়েন বলে। সে-সময়টা তৃণাই অন্যদের ফোন করে। কিন্তু মণীশের মেসে ফোন নেই, ওকে ফোন করা যায় না। তৃণা নিজেই বুঝতে পারছিল না, তার কেন চিন্তা হচ্ছিল।

টেবিলের ওপর একগোছা চিঠি আছে আজ। একটা মফস্বলের লিট্‌ল ম্যাগাজিন, দুটো পোস্টকার্ড, একটা খাম। ম্যাগাজিনটা সরিয়ে রাখল তৃণা, পরে দেখবে। পোস্টকার্ড দুটোয় দ্রুত চোখ বোলাল। একটায় বারাসাত থেকে অজিত ত্রিবেদী লেখা চেয়েছেন।

অন্যটায় এক পাঠকের ভালোবাসার কথা। এবার খামটা নিল তৃণা। লম্বা লেখা-পাঠানোর খাম নয়, চাঁপাফুলরঙা ডাকঘরের খাম। তার নাম-ঠিকানা লেখা হস্তাক্ষরের ছাঁদটা চেনাও নয়, অচেনাও নয়। অন্তত এই হস্তাক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা সে কখনো দেখেনি। তৃণা খামটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। কার হতে পারে! এটা বেশ মজার খেলা। অনেকে খামের পেছনে নিজের নাম লিখে ফ্যালে। সেক্ষেত্রে কোনো মজা থাকে না। অনেকে লিখে রাখে, গেজ হু? সেসব না লিখলেও প্রতিটি খামে-বন্ধ চিঠির উল্টোদিকে অশরীরী অক্ষর বলতে থাকে—'বল তো কে!' তৃণা চেয়ারে হেলান দিয়ে খামটা হাতে নিয়ে বসে রইল। শরীর ক্লান্ত লাগছে। মন শান্ত হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এই চিঠিটা পড়ে ফেলে সে লেখা নিয়ে বসে যাবে।

অনেকটা সময় নিয়ে স্ক্যালপেল চালিয়ে চালিয়ে অত্যন্ত নিপুণ করে খামের মুখটা ছিঁড়ল তৃণা। এটা তার মনঃসংযোগের পদ্ধতি। প্রতিটি কাজ সে এখন দারুণ মন দিয়ে করবে। খামের ভেতর থেকে বেরোল ভাঁজ করা পাতা, ডায়রি থেকে ছেঁড়া। ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে টেবিলেব ওপর বিছিয়ে রাখল সে। হাতের লেখা চেনা, বেশ চেনা। কৌতূহল হচ্ছে। সম্বোধন নেই কোনও। চিঠি শুরু হয়ে গেছে পাতার একেবারে গোড়া থেকে।

'তোর জন্যে ডায়রি থেকে এ পাতা ছেঁড়ার কথা ছিল না আমার। অথচ দ্যাখ, আমি তাই করে বসেছি....'

তৃণা পড়তে পডতেই বুঝে যাচ্ছিল সব। তলায় কোনো নামসই নেই। একটা চোখ আঁকা আছে। প্রচ্ছদ আঁকার সময়ও মণীশ নিচে ডানকোণে এই চোখটাই এঁকে দেয়। চিঠির চোখটা একটু অন্যরকম, ওতে একফোঁটা জল লেগে আছে। মণীশ খুব কষ্ট পাচ্ছে। এই কষ্টের কথা তৃণা এতদিন জানত না। কিন্তু এই কষ্ট কিরকম সেকথা তৃণা খুব ভালো করে জানে।

চিঠিটা ঠিক আড়াইবার পড়েছিল তৃণা। প্রথমবার কৌতূহলে, দ্বিতীয়বার বিস্ময়ে, তৃতীয়বার দুঃখের সঙ্গে পড়তে শুরু করে মাঝামাঝি এসে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে।

মণীশ, তৃণা, দেবাশিস, সুব্রত আর শ্যামল, তারা একটা দল। পরস্পরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত কয়েকজন বিচ্ছিন্ন মানুষ। একসঙ্গে সময় কাটায়, হৈ হৈ করে আড্ডা মারে। ভেতরে-ভেতরে প্রত্যেকে চূড়ান্ত একা। এই নিঃসঙ্গতাবোধই বোধহয় ওদের একত্র করে রেখেছে। ওরা সম্পর্ক গড়ে এবং ভেঙে ফ্যালে। ওরা বিশ্বাস করে, এ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, অন্তত ওদের জীবনের, সৃষ্টি। তৃণার লেখা, মণীশের ছবি, শ্যামলের গান, সুব্রত আর দেবাশিসেরও কবিতা। ওরা জানে ওদের কোনো সুখী সংসার হবে না কোনোকালে, প্রেম টিঁকবে না বেশিদিন, আশ্রয় বলতে দ্বিতীয় কারো বুকে মাথা রাখা মুহূর্তের বেশি হবে না কখনো। অথচ তা-ই চাইবে তীব্রভাবে ; চাইবে আর লিখবে ; আর আঁকবে ; আর গান বাঁধবে সমস্ত না-পাওয়াকে তীব্রতর আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করে। ওরই মাধ্যমে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে সমস্ত অসফল সম্পর্কের ক্ষত, স্থূল অতৃপ্তি। শ্যামল আর

অনামিকা একসঙ্গে থাকে, তবে ওরা এখনো বিয়ে করেনি। আপাতত ওরা অবশ্য ভালো আছে। শ্যামল এলোমেলো, স্বার্থপর। অনামিকা ঠাণ্ডা, গোছালো, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তৃণাদের সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব। তবে ওদের দলের বাইরে বাইরেই থাকে। কতদিন ওরা এই সম্পর্ক ঠিকঠাক রাখতে পারবে কে জানে। আজকাল এইসব ব্যাপার এমন অনিত্য, ক'দিন আগেও যেন অন্তত এই শহরে এই সমাজে এমনটা ভাবাই যেত না।

এত অবধি ভেবেই তৃণা নিজেকে সামলে নিল। সে এমন কথা কক্ষনো ভাবতে চায় না। শ্যামল না পারুক, অনামিকা পারবে। শ্যামল অসামান্য প্রতিভাবান, অনামিকাকে নিজের ধরনে প্রবল ভালোবাসে, সম্পূর্ণ নির্ভর করে ওর ওপর। অনামিকা সমস্ত চাপ এমন অনায়াসে সামলায় যে বিস্মিত হতে হয়। গভীর প্রেম এবং বোঝাপড়া না থাকলে এমনটা হয় না। ওরা দু'এক বছর লিভ টুগেদার করার পরই বিয়ে করে নেবে, তৃণা জানে। তৃণা তাই চায়। ঈশ্বর জানেন, তৃণা কখনোই এমন চাইতে পারে না যে অনামিকাকে ছেড়ে শ্যামল তার কাছে চলে আসুক।.

আশ্চর্য, তৃণা ভাবছিল। আশ্চর্য এই, যে, সে যে শ্যামলকে কামনা করে, একথা সে আর কাউকে বলেনি, শুধু মণীশকে ছাড়া। মণীশ একদিন দুপুরে এসেছিল ওর বাড়িতে। ওরা পরস্পব ওদের বিগত ভেঙে-যাওয়া সম্পর্কগুলো নিয়ে কথা বলছিল। মণীশ ভীষণভাবে বলছিল তিলোত্তমার কথা। এই মেয়েটিকে তৃণা চেনে, যাদবপুরে ইংরাজি পড়ায়। মণীশের সঙ্গে তিলোত্তমার সম্পর্ক ভেঙে গেছে আজ মাসখানেক হল। ভেঙেছে প্রবল তিক্ততার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু মণীশকে দেখে মনে হচ্ছিল এখনো যথেষ্ট ইনভল্‌ভ্‌ড্‌। ঐদিনই কথায় কথায় মণীশ তৃণাকে জিজ্ঞেস করে—তুই কি আপাতত সত্যিই প্রেমহীন?

—দেখছিস তো আমাকে। কারো সঙ্গে প্রেম করলে এই মেঘলা দুপুরে তোর সঙ্গে বসে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতাম?

—প্রেম করছিস না, জানি। প্রেমে পড়েছিস কি না সেইটেই জানতে চাইছি।

তৃণা মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল। বলতে ইচ্ছে করেছিল। নির্জন সময়ে সহৃদয় বন্ধুর কাছে গোপন প্রেমের গল্প বলার অদম্য লোভ শিরশিব করে উঠেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু দ্বিধা বোধ করছিল। একথা সে আজ পর্যন্ত কাউকে বলেনি। শ্যামলকেও নয়। সে তো নিজেই বুঝতে পারেনি এতদিন। শ্যামল তার থেকে প্রায় পাঁচবছরের ছোট, ওর সঙ্গে মারপিটের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের পাঁচজনের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোনটা প্রেম আর কোনটা বন্ধুত্ব তা ওরা নেড়েচেড়ে দেখেনি কক্ষনো। সকলে নিবিড় হয়ে বসে যখন কবিতা, ছবি, গান, জীবিকা, প্রেম আর প্রেম ভেঙে-যাওয়ার কথা বলে, কথা শেষ হয়ে যাওয়াব পর জমাট নৈঃশব্দটুকু বুঝিয়ে দেয়, ওরা কাছাকাছি আছে; এত কাছাকাছি যে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ারও দরকার পড়ে না। অথচ, শ্যামল যেদিন অনামিকার সঙ্গে ঘর বাঁধল, তৃণার বুকের মধ্যে কী একটা কামড়ে ধরেছিল। কোনো

ক্ষোভ, ঈর্ষা বা অভিমান নয়। একটা বেদনাবোধ। ওটা ছিল তার কাছে একটা আবিষ্কার। মনে হয়েছিল, বহুদিনই তো সে কোনো পুরুষকে গোপনে ভালোবাসেনি। শ্যামল যদি সেই পুরুষ হয় তবে হোক।

এ আজ মাস দশেক আগেকার কথা। শ্যামল-অনামিকার যৌথ-জীবনের বছর ঘুরতে চলল। তৃণা তার এ সমস্ত অনুভূতির খবর সযত্নে গোপন রেখেছে এতদিন। লালন করেছে পবিত্র দুঃখের মতো, লিখেছে বহু লেখা। আজ সে আর পারল না। বলার সময় তার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়েছিল, নিঃশ্বাস গরম। বাচ্চাদের মতো বোকা বোকা ভাবে বলেছিল—মণীশ, কাউকে বলিস না, আমি শ্যামলকে ভালোবাসি। বলার পরই বাক্যের গঠনগত ছেলেমানুষিতে তৃণার খুব লজ্জা করছিল। সে কি ক্লাস এইটের ছাত্রী হয়ে গেল নাকি। মণীশ নাড়া খেয়েছিল। সোজা চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—অনামিকা জানে?

—আহ্, অনামিকা জানবে কিভাবে, শ্যামলই জানে না!

—মানে?

—মানে তো তুই বলেছিস, মণীশ। আমি শ্যামলের সঙ্গে প্রেম করি না, করার ইচ্ছে নেই। আমি ওর প্রেমে পড়েছি, ব্যস্ এইটুকুই।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তৃণা নিজেই লক্ষ্য করেছিল যে সে কেমন হাল্কা বোধ করছে, আর তার ব্যক্তিত্বও ফিরে আসছে। ঐ ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনার জন্যেই সে আবারও যোগ করেছিল,—শ্যামল কোনোদিন জানবেও না। কারণ ওকে জানিয়ে আমার লাভ নেই। ওর সঙ্গে থাকাব বাসনা তো নেই আমার। তবে, আমার কবিতার পুরুষ ও-ই....।

মণীশ ঘাড় নেড়েছিল। অর্থাৎ বুঝেছে।

এই মণীশই, এতকিছু জানার পর, আজ তৃণাকে প্রেমের কথা লিখে পাঠিয়েছে। ওর বিগত কয়েকদিনের পরিবর্তিত আচরণের মানে তবে এই! তৃণা বেশ বুঝতে পারছে এখন। মণীশের ঐ গুটিয়ে থাকা, ছটফটানি ফুরিয়ে গিয়ে কেমন চুপচাপ ছায়ার মতো হারিয়ে থাকা—মানুষ তখনই এমন জলের তলায় ডুবে থাকতে চায় যখন সে প্রেমে পড়ে। সব প্রেম নয়, যে প্রেম দুঃখের মতো, পবিত্র দুঃখের মতো, তৃণা জানে।

তৃণার খুব আনন্দ হচ্ছিল। গভীর দুঃখ। আসলে আনন্দ না দুঃখ, তৃণা বুঝতে পারছিল না। এমন টনটনে, বুক ভরে-ওঠা অনুভূতি কিসে হয়—আনন্দে, না দুঃখে? নাকি দুটোই মিশে থাকে একসঙ্গে? এই অনুভূতি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। উপচে পড়ে। তৃণার আঙুল ছটফট করে উঠল। কর্ডলেস টেলিফোনটা টেবিলের ওপর রাখা। ওটা তুলে নিয়ে নম্বর টিপল সে। ওপারে আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর।

—হ্যাঁ, বলছি!

—শ্যামল, আমি তৃণা।

—হ্যাঁ, বল্ রে। তোর কবিতাগুলো চাবুক হয়েছে, বুঝলি!

শ্যামলের গলাতে যেন কেমন একটা অস্বস্তি। ও যেন একটু কৃত্রিম সুরে কথা

বলছে! কিছু লুকোতে চাইছে এমন একটা ভাব।

—এমনি করে কথা বলছিস কেন? বিরক্ত করলাম নাকি?

—কিসের বিরক্ত?

—না, এই, বউ-এর সঙ্গে কিছু হচ্ছিল টচ্ছিল? অসুবিধে করলাম?

—না। অনামিকা চলে গেছে।

—মানে? কোথায়?

—মানে, ও প্রবালের কাছে চলে গেছে। আমাকে বলেছিল যে ও প্রবালের প্রেমে পড়েছে। আমি কোনোরকম রি-অ্যাক্ট করিনি, বুঝলি। দুঃখ পেয়েছিলাম। কেঁদেছিলাম একটু। ওকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে থাকো। থাকল না। তোরা চলে যাওয়ার একটু পরে প্রবাল এল। বলল, কাল দু'মাসের জন্যে দিল্লী যাচ্ছে। আজ রাতটা অনামিকার সঙ্গে থাকতে চায়। মানে, অনামিকাও চায়। আমি রেগে গেছিলাম। খিস্তি করেছিলাম, বুঝলি। তাইতেই ও চলে গেল।

—ফিরে আসবে।

—না, প্রবালের সঙ্গে দিল্লী চলে যাবে। ব্যবস্থা করে নেবে বলেছে।

—ভাবিস না, শ্যামল। ওসব রাগের কথা। একরাত দু'রাত কাটিয়ে তোর কাছেই আসবে। ভালোবাসাটা বুঝবে। দেখিস!

শ্যামল কাঁদছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—এখন কী করি, কী করব আমি?

তৃণা একবার ভাবল যে বলবে—আমি চলে যাচ্ছি তোর কাছে। কিন্তু তা না বলে ও অনেকক্ষণ ধরে একথা সেকথা বলে সান্ত্বনা দিল শ্যামলকে। বাচ্চা ছেলের খেলনা হারিয়ে গেলে মা যেমন করে বোঝায় তেমনি। বলল—ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে আমি সুব্রতকে নিয়ে চলে যাব তোব কাছে। মণীশ আর দেবাশিস নিশ্চয়ই বিকেলের আগে পারবে না।...আরে, ভেঙে পড়ছিস কেন! আমরা আছি না!

শ্যামল ফোন রাখার পর তৃণা রিসিভারে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, তোকে ভালোবাসি সোনা। তোকে চাই। এক্ষুনি নয়। আস্তে আস্তে।

এই একই কথা মণীশ তৃণাকে, তৃণা শ্যামলকে, শ্যামল অনামিকাকে, অনামিকা প্রবালকে বলছে প্রতিমুহূর্তে। প্রেম গড়িয়ে চলেছে একটা লম্বা টানা ট্র্যাক বেয়ে একটা বলের মতো। ঐ বলের গা কিংবা তার গড়ানোর পথ—কোনোটাই ঠিক মসৃণ নয় তো, তাই ফ্রিকশন হচ্ছে প্রচুর। ফুলকি ঠিকরে উঠছে, ঠিকরে উঠছে কবিতা ছবি আর গান। বলটা গড়িয়েই চলেছে। ওটা কোথায় থামবে, তৃণা জানে না।

টেনশনের ঋতু

শ্রাবণীর পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে।

সাতমাস হতে চলল। কথাটা যে শ্রাবণীর সব সময় মনে থাকে তা নয়। বরং বেশিরভাগ সময়েই থাকে না। বেশ কিছুদিন পবে পরে হঠাৎ একটা ধারালো ছুরির মত ঝলসে উঠে মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে যায়। মনটা তারপর বেশ কিছুক্ষণ দুশ্চিন্তায় কুঁচকে থাকে।

যেমন আজ। সকালে অফিস যাওয়ার পথে সে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসস্টপে সিমেন্টের ছাউনি, সিমেন্টের পিলার, পিলারের গায়ে অজস্র বিজ্ঞাপনের কাগজ সাঁটা। রোজই সে এই বাসস্টপে এসে দাঁড়ায়, বিজ্ঞাপনগুলো এমনিই চোখে পড়ে। আলাদা করে পড়ে দেখার কোনও প্রশ্নই নেই। আজ অন্যমনস্কভাবে শ্রাবণীর চোখ মোক্ষম জায়গায় আটকে গেল। 'ঋতুবন্ধে'...'ঋতুবন্ধে'... 'ঋতুবন্ধে'—যেদিকে তাকাও বাসস্টপের পিলারগুলো সর্বাঙ্গে উৎকট গোলাপির ওপর বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা এই কথাটি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। কাল এগুলো ছিল না। নতুনই লাগানো হয়েছে। যে লাগিয়েছে সে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্দেহ নেই, পঁচিশটা ছোটবড় কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় না সেঁটে এমনভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট করে সেঁটেছে যে, দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মারাত্মক। শ্রাবণীর মাথায় ছুরিটা আবার ঝলসে ওঠে। সাতমাস...সাত মাস হতে চলল...

শ্রাবণীর বয়স ছাব্বিশ। বেসরকারি চাকুরে, মাইনে সামান্যই। বিবাহিত। কিন্তু সন্তানসম্ভবা নয়। প্রথমে অবশ্য সে এই ভয়টাই পেয়েছিল। এমনিতে কোনও মাসেই তারিখ মনে থাকে না তার, সে থাকে তার নিজের মত, পিরিয়ডও নিজের মত হয়ে যায়। খুব একটা খেয়াল না রাখলেও শ্রাবণী এটা জানত যে তার পিরিয়ডের ব্যাপারটা তেমন নিয়মমাফিক নয়। দুটোর মাঝখানে যে সময়ের ফাঁক, সেটা প্রায়ই কমে বা বেড়ে যায়। তারিখের হিসেব না রেখেও শ্রাবণী কোনও কোনও বার বুঝেছে যে সময়ের আগেই পিরিয়ড হয়ে গেল তার। কখনও মনে হয়েছে এবার যেন হতে বেশ দেরি করছে। আসলে, হিসেবনিকেশের কথা নয়, এটা একটা অভ্যাস। তেরো বছর বয়স থেকে চালু হয়ে যাওয়া একটা বায়োলজিকাল ক্লক। শ্রাবণী সেকেণ্ড মিনিট ঘন্টা না মেপেও, যখন বারোটা বাজার কথা তখন দশটা কিংবা তিনটে বাজতে দেখে ধরতে পারত, ঘড়িতে ভুল সময় বলছে।

গত ডিসেম্বরেই একদিন সে হঠাৎ খেয়াল করে, বেশ কিছুদিন তার পিরিয়ড হয়নি। চৌঠা অক্টোবর ছিল অষ্টমী। ঐ দিন সন্ধেবেলা অতনুর সঙ্গে বেরোনর কথা। অতনু

নতুন পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, শ্রাবণীর সাজগোজ সারা হলেই বেরোবে। শাড়ি পরতে পরতে শ্রাবণীর কেমন সন্দেহ হল। বাথরুমে গিয়ে দেখল, যা ভেবেছে তাই। শুরু হয়ে গেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়ার থেকে ন্যাপকিন বের করতে করতে শ্রাবণী ভেবেছিল—ভাগ্যিস এখনই সে টের পেয়েছে ব্যাপারটা। নইলে কোনও প্রোটেকশন না নিয়েই বেরিয়ে পড়ত ঘুরতে এবং অবধারিত নষ্ট হত নতুন টাঙ্গাইল শাড়িটা।

এই ঘটনার জন্যেই চৌঠা অক্টোবর তারিখটা তার মনে ছিল। ডিসেম্বরে পৌঁছে তার বায়োলজিকাল ক্লক যখন ফুঁক ফুঁক করে অ্যালার্ম বাজালো, শ্রাবণী হিসেব করে দেখল তার শেষ পিরিয়ড হয়েছে সেই দু'মাস ছ' দিন আগে।

শ্রাবণী বেশ ঘাবড়ে গেল। আগেও হয়ত এমন দেরি কখনও কখনও হয়ে থাকবে, সে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। সবার আগে যে সম্ভাবনার কথা মাথায় এল তার, তাতে ভয়ই পেয়ে গেল সে। মোটে পাঁচমাস হল অতনুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, দুজনের বাড়ি থেকেই প্রবল অমতে। অতনুর সঙ্গে তার আলাপ ও প্রেমের সূচনা থেকেই আপত্তির শুরু, কাজেই ওরা এভাবেই বিয়ে করতে গোড়া থেকে প্রস্তুত ছিল। রেজিস্ট্রি করার আগের দিনই ওরা কসবার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় চলে আসে। অনেক চেষ্টা করেও শহরের মধ্যে আড়াই হাজারের কমে বাসযোগ্য ফ্ল্যাট পাওয়া যায় নি। সেলামি জোগাড় হয়েছিল ধার করে। আর এখন শ্রাবণীর মাইনের প্রায় পুরোটাই বাড়িভাড়ায় চলে যায়। তা যাক, অতনুর আয়ে সংসারও চলে যায় একরকম করে। কিন্তু তাই বলে এখন একটা বাচ্চা! শ্রাবণী ভাবতেই পারে না।

অতনুকে বলবার পর অতনু কিন্তু খুশি হয়ে উঠেছিল। অকৃত্রিম উত্তেজনায় শ্রাবণীকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল—'সত্যি! দারুণ খবর, সোনা!'

শ্রাবণী কিছুক্ষণ অতনুর বুকের মধ্যে দম বন্ধ করে থাকল। বুঝতে চেষ্টা করল অতনুব উচ্ছ্বাস কতটা ঠিক। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'তুমি চাও?'

—'তুমি চাও না?'

—'চাই। কিন্তু এক্ষুনি কি আমরা পারব?'

অতনুকে চিন্তিত দেখিয়েছিল। শ্রাবণী বুঝতে পেরেছিল, অতনুরও সন্দেহ আছে এই মুহূর্তে নতুন একজন আগন্তুককে তাদের সংসারে নিয়ে আসার জন্য অন্তত আর্থিক দিক দিয়ে তারা কতখানি প্রস্তুত সে সম্বন্ধে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না, পাছে তার মনে আঘাত লাগে। অতনু চুপ করেই ছিল, শ্রাবণী যেন খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলল—'তাড়াতাড়ির কি আছে! নিজেদেরটা নিজেরা না বুঝে চললে...আর, এরকম তো হয়ই...'

—'তুমি শিওর তো?'

—'কোন ব্যাপারে?'

—'প্রেগন্যান্সি?'

শ্রাবণী মাথা নেড়েছিল। —'না, টেস্ট করিয়ে নিতে হবে। তবে দু'মাসের ওপর পিরিয়ড হয়নি, মনে হচ্ছে এটাই হবে।'

অতনু অনুতপ্ত গলায় বলেছিল—'স্যরি সোনা, কিন্তু আমরা তো খুব কনশাস থাকি, অ্যালার্ট থাকি, তাও যে কী করে হল...' ওর স্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছিল,— 'তোমার খুব কষ্ট হবে....'

শ্রাবণী এবার সস্নেহে অতনুকে জড়িয়ে নিয়েছিল। বলেছিল —'যাঃ, এমনি করে না। দোষ কি শুধু তোমার একার নাকি?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল—'আগে টেস্টটা করাই। যদ্দূর শুনেছি সাক্‌শনে খুব কষ্ট হয় না, অ্যানেস্থেশিয়া করে নেয়।'

অনেকক্ষণ দুজনেই আর কোনও কথা বলেনি। হঠাৎ অতনু শ্রাবণীর পেটের উপর হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল —'ইশ,...আমাব ভীষণ আনন্দ হয়েছিল, জানো!...আচ্ছা, আমরা সত্যিই কি পারব না?'

শ্রাবণীও ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে গা শিরশির করছিল তার। চাকরি বাকরির অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, সংসারের অবস্থাও তেমন ভালো নয়, তারা এখনও গুছিয়েই উঠতে পারল না ঠিক মত। তার ওপরে ..এরই মধ্যে...। কিন্তু কী এক দুর্নিবার ইচ্ছে ছম ছম করে ছড়িয়ে পড়ছে তার বুকের ভেতর। তাদের চাইতে খারাপ ভাবে কত মানুষ আছে, আর তারা একটা রিস্ক নিতে পারে না?

আসলে শ্রাবণীর বুদ্ধি একটা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার হৃদয় চাইছিল উল্টো সিদ্ধান্ত নিতে। বাস্তবে তাকে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে হয়নি। মূত্র পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার গর্ভে কোনও ভ্রূণেব অস্তিত্ব নেই। পরস্পবের দিকে তাকিয়ে প্রথমে স্বস্তির হাসি হেসেছিল দুজনে। একটু পরে শ্রাবণীর চুপচাপ মেঘলা মুখেব দিকে চোখ পড়তে অতনু নরম হাতে ওর কাঁধ ছুঁয়েছিল। গভীর গলায় বলেছিল—'দূর বোকা মেয়ে, দুঃখ পেতে নেই। আমাদের এখনও সময় হয়নি।' তারপর শ্রাবণীর কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে ফিসফিস করেছিল—'আজ রাত্রে দারুণ ভালোবাসব, সাবধানে।'

আর এখন মে মাস। কী করে যে দিনগুলো হু হু করে চলে গেল, শ্রাবণী বুঝতেই পারল না। এর মধ্যে একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা স্লিপ করে পড়ল অতনু, বাঁ পায়ের পাতা মচকে গেল, চোট ভালোই লেগেছিল। বিছানায় শুয়ে থাকতে হল বেশ কয়েক সপ্তাহ। আর এক ঝঞ্ঝাট, বাড়িঅলার সঙ্গে জল নিয়ে অশান্তি শুরু হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই সকালে কয়েকঘন্টা ছাড়া কলে জল আসত না, এখন সেটাও প্রায় বন্ধ হওয়াব মুখে। বড় বড় দুটো বালতি কিনতে হয়েছে শ্রাবণীকে, জল যেটুকু পাওয়া যায়

তার পুরোটাই ধরে রাখতে হয়। প্রচণ্ড অসুবিধে হয়, তবু সেও একরকম সামলে নিচ্ছিল তারা। কিন্তু বাড়িঅলা ভদ্রলোক ছুতোয় নাতায় অভদ্র ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কী করবে শ্রাবণীরা, এক্ষুনি আর বাড়ি বদলানো তো সম্ভব নয়।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শ্রাবণীর পিরিয়ড কিন্তু আর শুরু হল না। আর কোনও উপসর্গ নেই যদিও, পেট ব্যথা ট্যাথাও করে না। এমনিতে সে বেশ রোগা, কিন্তু কর্মঠ। অফিসে কাজেব চাপ অত্যন্ত বেশি, শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া মাথাও ঘামাতে হয়। সংসারের কাজ সে আর অতনু ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ওতে শ্রাবণীর অসুবিধে হয় না। নিঃশব্দে ঋতু বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনওরকম অস্বাভাবিকত্ব নেই।

বোধহয় সেই কারণেই, শ্রাবণী এই সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায়নি। মনের মধ্যে অস্বস্তির ছুরিটা যখন ঝলসে ওঠে, সে ভাবে, পরের মাসে ডাক্তার দেখাবে। তারপর সে চিন্তা মনের তলেই চাপা পড়ে যায়। আসলে, মনের তলে আরেকটা মন ভাবে, তার বোধহয় গোপনে কোনও বড় অসুখই করেছে, ডাক্তারের কাছে গেলেই তিনি নানারকম পরীক্ষা করিয়ে অসুখটাকে টেনে হিঁচড়ে সামনে নিয়ে আসবেন। তখন তার পেছনে আবার দৌড়াদৌড়ি, টাকা খরচ। তার চাইতে, কষ্ট তো হচ্ছে না কোনও, হলে তখন দেখা যাবে। অতনুও এর মধ্যে দু'একবার তাগাদা দিয়েছে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্যে। শ্রাবণীব একই উত্তর—'দেখি, পরের মাসে পারলে যাব।'

আজ সকালে বাসস্টপের বিজ্ঞাপনটা শ্রাবণীর চোখে লেগে রইল। অফিসে কাজের চাপে দিশেহারা অবস্থাতেও তার মাথাব মধ্যে অনবরত নাচানাচি করতে লাগল ঐ ক্যাটকেটে গোলাপি রং আর তার ওপর বড় মোটা কালো অক্ষরে লেখা সেই কথাটি, পাশাপাশি, ওপরে নীচে, হাজারে হাজারে। খুব অবাক লাগল শ্রাবণীর। একটা রদ্দিমার্কা বাজে বিজ্ঞাপনের এত মহিমা!... নাঃ, সত্যিই অকারণে বড় দেরি করে ফেলেছে সে। আজ ফেরার পথে কোথাও একজন ডাক্তার দেখিয়ে নেবে।

ডাঃ কমলিকা নাথের বাড়ি-কাম-চেম্বারের ঠিকানা অফিসেই জোগাড় হয়ে গেল, সহকর্মী মন্দিবার কাছ থেকে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয় কিনা জানা নেই। যাক গে, গিয়ে তো পড়া যাক আগে। অতনুর আজ ফিরতে সাড়ে দশটা এগারোটা বাজবে, বাড়ি ফেরার তাড়া নেই অন্তত।

চেম্বারে পৌঁছে শ্রাবণী দেখল নাম লেখাতে হচ্ছে। তার আগে দু'জন পেশেন্ট। ঘন্টাখানেক বসে থাকার পর তার ডাক পড়ল।

ডাঃ নাথের বয়স হয়েছে। অবিবাহিতা। টেবিলের ওপর একটা নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে ডাঃ মিস্ কমলিকা নাথ, এম বি বি এস, ডি জি ও (ক্যাল) এফ এ সি এস (ইউ এস এ) প্রভৃতি আরও অনেক কিছু। শ্রাবণী যখন বাইরে ওয়েটিং রুমটাতে বসে ছিল, ঝকঝকে সোফা-সেন্টার টেবিল-পর্দা-আলোর শেড-অয়েল পেন্টিং-এর বাহার দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণেছিল। এ কার কাছে পাঠালো মন্দিরা! তার তো একজন মোটামুটি ডাক্তার হলেই চলত। মাসের আজ বাইশ তারিখ।...আর এখন, কমলিকার চেহারা এবং নেমপ্লেটে

অ্যালফাবেটের সংখ্যা দেখে বুঝতে বাকি রইল না ইনি রীতিমত বড়মাপের কেউ।

—'আসুন বসুন। বলুন, কী ব্যাপার।' ডাঃ নাথের কণ্ঠস্বরটি বেশ লাগসই রকম ভারী। শ্রাবণীর চকিতে একবার মনে হল, এমন হঠাৎ করে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। তার ব্যাগে সব মিলিয়ে দুশো টাকামতন আছে, বাড়ি ফেরার পথে তেল আটা আলু-টালু ইত্যাদি কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ফিজটা ওর মধ্যে হবে তো? শ্রাবণী ঈষৎ ইতস্তত করে বলল—'গত সাতমাস ধরে আমার পিরিয়ড হচ্ছে না।'

ডাঃ নাথের চোখ সটান শ্রাবণীর সিঁথির দিকে। সেখানে কিছু না পেয়ে নেমে এসে তার কব্জিতে ঘোরাফেরা করতে করতে বললেন—'হুঁ, লাস্ট কবে হয়েছিল তারিখটা মনে আছে?'

—'আছে, চৌঠা অক্টোবর।'

ডাঃ নাথ একটা প্রেসক্রিপশনের পাতা টেনে নিয়ে খসখস করে পেন চালাতে চালাতেই জিজ্ঞেস করলেন

—'নামটা কী বলুন তো—মিস্—'

—'না না, মিসেস...মিসেস শ্রাবণী ভৌমিক।'

আরও কিছু জরুরী প্রশ্নোত্তরের পর ডাঃ নাথ শ্রাবণীকে শুইয়ে হাতে প্লাস্টিকের গ্লাভ্স্ পরে তার শরীরের ভেতরে আঙুল চালিয়ে দিলেন। টিপেটুপে খুঁটিয়ে দেখলেন মন দিয়ে। শ্রাবণীর অস্বস্তি হচ্ছিল।

—'লাগছে?'

—'একটু একটু।'

—'ইন্টারকোর্সের সময় লাগে নাকি?'

—'না না'...

ডাক্তার আরও খানিকটা পরীক্ষানিরীক্ষার পর ছেড়ে দিয়ে হাতের গ্লাভ্স্ খুলতে খুলতে বললেন—'না, চিন্তার কিছু নেই, সবই নর্মাল রয়েছে। তাও একটা আল্ট্রা-সোনোগ্রাফ করিয়ে নেবেন, লিখে দিচ্ছি। আপনি কী করেন কী?'

শ্রাবণী বলল।

—'আপনার হাজব্যান্ড কী করেন?'

শ্রাবণী বলল। ডাঃ নাথ কেমন একটু আন্তরিক গলায় বললেন—'বসুন। বসুন একটা কথা বলি। ভয়ের কিছুই নেই। সোনোগ্রাফিটা করিয়ে আনুন, ওটা দেখেই আমি ওষুধ দিয়ে দেব। পিরিয়ড শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা বলুন তো, আপনার কি খুব টেনশন হয়?'

শ্রাবণী ভাবছিল। টেনশন তো হবেই। না হয়ে উপায় আছে? এনার দক্ষিণাটা কত? শেষে একটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে যাবে না তো!

ডাঃ নাথ প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন। লেখা শেষ করে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন.—'টেনশন কমান, টেনশন কমান। ঐটেই আপনার সমস্যার আসল কারণ। আজকাল স-অ-ব এই ব্যাপার, বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও আসছে এইসব প্রবলেম নিয়ে।

আনন্দে থাকুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা! নমস্কার!'

শ্রাবণীর বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। কোনওরকমে মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বলল—'থ্যাঙ্কিউ,...আপনার ফিজ্‌টা...?'

—'একশো পঞ্চাশ।'

—'হ্যাঁ, এই যে।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বাঁচা গেছে। গোটাগুটি একটা একশো আর একটা পঞ্চাশের নোটই ছিল শ্রাবণীর ব্যাগে। নইলে দশ পাঁচ দুই জড়ো করে গুণে গুণে দিতে হলে লজ্জার একশেষ হত।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে শ্রাবণী বুক ভরে নিশ্বাস নিল। ভীষণ আরাম লাগছে তার। সেটা তার কোনও অসুখ হয়নি একথা জেনে, নাকি ফিজের টাকাটা ঠিকঠাক দেওয়া গেছে বলে—শ্রাবণী ঠিক ঠাহর করতে পারল না। আল্ট্রাসোনোগ্রাফিটা এ মাসে হবে না, কিন্তু পরের মাসে ঠিক করিয়ে নেবে সে। এতদিন দেরি যখন হয়েই গেছে, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে অসুবিধে নেই।

ডাঃ নাথ জিগ্যেস করেছিলেন তার টেনশন হয় কিনা। কিন্তু উত্তরটা আর শোনেন নি। শ্রাবণী জানে, উনিও জানেন টেনশন ছাড়া জীবনযাপন এখন কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু ছেলেদের কথা থাক, সব মেয়েদেরই কি তার মত পিরিয়ডের গণ্ডগোল হচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? নাকি, তার টেনশনটাই একটু বেশি!

অতনুর সঙ্গে প্রায় দশবছর প্রেম কবার পর বিয়ে করেছে তারা। পাশাপাশি পাড়ায় বাড়ি। ঐ দশ বছর আগে থাকতেই জটিলতার শুরু। বাড়িতে তুমুল অশান্তি, জোর জবরদস্তি, মানসিক চাপ। অতনুকে কেন যে পছন্দ কবল না তার বাবা মা! অতনুর বাড়িতেও এই একই ব্যাপার। বিয়েব আগের দিন থেকেই দু'জনে বাড়িছাড়া, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত খুব সহজে তো নেওয়া যায়নি। এ বাজারে কলকাতা শহরে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সংসার চালানো যে-সে কথা নয়, তাও আবার শূন্য থেকে শুরু করে। ওরা দু'জনেই বাড়ি থেকে প্রায় খালিহাতেই বেরিয়ে এসেছিল। শ্রাবণী পাগলের মত চাকরি খুঁজে গেছে। একা অতনুর চাকরি ভরসা করে সংসার পাতার বোকামি সে করেনি। এখনও তাদের ফ্ল্যাটে অধিকাংশ আসবাবপত্রই ভাড়া করা। বিযের পর আলাদা থেকেও তো শান্তি নেই, তারা না চাইলেও উভয় পক্ষেরই বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের নিয়মিত আসাযাওয়া লেগেই থাকে তাদের বাড়িতে। তাদের উদ্দেশ্যও শুভ নয়। শ্রাবণী এবং অতনু দু'জনেই সন্দেহ করে, এদের পিছনে মা বাবাদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। ওঁরা চান ওদের মধ্যে অশান্তি বাধুক। এই পরশুদিনই শ্রাবণীর মাসি এসে জানিয়ে গেছেন, অতনুর বাবা নাকি তার বাবাকে রাস্তার মধ্যে চিৎকার করে কুৎসিত ভাষায় শাসিয়েছেন। যা নয় তাই বলে গালাগাল করেছেন। শ্রাবণীর উচিত এই মুহূর্তে অতনুকে ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া। একই রকম ভাবে, শ্রাবণীর দাদা যে অতনুকে দেখে নেবে বলেছে, সে খবরও কয়েকদিন আগে অতনুরই খুড়তুতো ভাই পৌঁছে দিয়ে গেছিল। শ্রাবণীর একেকসময় ভয় হয়। এত কাণ্ডের পরও তারা দু'জনে দু'জনকে ভুল বুঝবে না তো? পারবে তো তারা একসঙ্গে

থাকতে!

তার এ আশঙ্কা অবশ্য অমূলক, সে নিজেই জানে। দশ বছরের সম্পর্ক তাদের, প্রেমের থেকেও পারস্পরিক বন্ধুত্বটাই তাদের আসল জোরের জায়গা। আর অতনুর মত ছেলেও বড় একটা দেখা যায় না, একইসঙ্গে ধীরস্থির মাথাঠাণ্ডা এবং জেদী।

শ্রাবণীর বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকল সে। বালতির জমানো জল হিসেব করে খরচ করতে হয়, কিন্তু এই গরমে বাড়ি ফিরে স্নান করা ছাড়া উপায় নেই। রাত্তিরে আর ভাত করবে না, ভাবল সে, চাউমিন বানিয়ে নেবে। অতনু চাউ ভালবাসে। শরীর মন হালকা লাগছে শ্রাবণীর। ডাঃ নাথ বলেছেন আনন্দে থাকতে। সে চেষ্টা করবে, প্রাণপণে চেষ্টা করবে খুশি থাকতে, হালকা থাকতে। ওটাই আসল ওষুধ। ডাঃ নাথ অত বড় ডাক্তার, কিন্তু ব্যবহারটা ভারি ভালো। শ্রাবণীর খুব ভালো লেগেছে। অতনু ফিরলে শ্রাবণী ওকে বলবে তার কোনও অসুখ করেনি, টেনশন না করলে সে ঠিক হয়ে যাবে।

চাউমিন সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখল শ্রাবণী। আলু আর বিন কুটে রাখল ঝিরি ঝিরি করে। তারপর পাখার তলায় শুয়ে পড়ল। সোয়া দশটা বাজে, অতনুর আসতে এখনও দেরি আছে। শ্রাবণী ঘুমিয়ে পড়ল। সারাদিনে যথেষ্ট ধকল গেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, সে যেন পাহাড়ের কোলে সুন্দর একটা ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুব আনন্দ হচ্ছে তার। বেড়াতে বেড়াতে বাগানের ধারে এসে সে দেখল একটা খাদ, নীচ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, ...নদী তো নয়, একটা রক্তের ধারা,...ধারাটা তারই শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে...নদীর মত চওড়া একটা রক্তের স্রোত, তাতে ঢেউ উঠছে...

অতনু সে রাত্রে বাড়ি ফেরেনি। ফেরার পথে শ্রাবণীর দাদা শোভনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। অতনু এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। শোভন ছাড়ে নি। দোষারোপ থেকে তর্কাতর্কি। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি ঘুযোঘুযি। অতনু তৈরি ছিল না, কিন্তু মার খেয়েছিল বেশী শোভনই। খেয়ে পালিয়েছিল। যাবার আগে বলে গেছিল, অতনুকে শিক্ষা সে দেবেই।

এই ঘটনার পর নিশ্চয়ই অতনুর মাথা কাজ করছিল না। এলোমেলো পায়ে কিছুটা হাঁটার পর একজায়গায় রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পায়, তার ভীষণ কাছে দুটো চোখ ধাঁধানো হেডলাইট। দু'হাতে চোখ ঢাকতে গিয়েছিল সে, তার আগেই হাওড়া-নাকতলা রুটের মিনিবাসটা তাকে গ্রাস করে ফ্যালে। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা রক্তে ভেসে যায়...

অতনুর পার্সে কসবার ঠিকানা ছিল। হাসপাতাল থেকে রাত বারোটা নাগাদ যখন বাড়িতে অ্যাকসিডেন্টের খবর যায়, শ্রাবণী অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। বহুদিন পরের একটা নিশ্চিন্ত গভীর ঘুম। আর তখনও, সে ঐ অদ্ভুত সুন্দর আর শান্ত একটা রক্তপাতের স্বপ্নই দেখছিল।

ছিন্নমূল

এবার মনে হয় তন্ময়ের একটা হিল্লে হয়েই গেল। অন্তত সবাই তাই বলছে। কিন্তু বলছে এমনভাবে, যেন হিল্লে হওয়ার কথা ছিল না। আর ছিল না যে, সে কথা সবচাইতে বেশি বিশ্বাস করে তন্ময় নিজে।

কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তে পড়তে মাঝপথে কলেজ ছাড়ল যখন তন্ময়, সবাই কপাল চাপড়েছিল। রাস্তায় বেরোলে লোকে ডেকে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করত, সুপরামর্শ দিত। তন্ময় দেখেছিল, তার একটি নিভৃত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কত মানুষকে কতভাবে ভাবাতে পারে। বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, আত্মীয়স্বজন—প্রত্যেকে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল : কেউ বিস্ময়, কেউ রাগ, কেউ হতাশা, কেউ ব্যঙ্গ, কেউ ঘৃণা...তন্ময় অবাক হয়েছিল এই ভেবে যে তার কোনও একটি কাজ এমন বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তাহলে! সে যথাযথভাবে পড়াশুনা সাঙ্গ করে গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরি পেলে আর যাই হোক, লোকে তার কথা ভাবত না।

যদিও সে ভালই জানে, যে, লোকে কী ভাবল তাতে অন্তত তার কিছু যাবে আসবে না। খুব একটা আত্মবিশ্বাসী সে নয়। বিপদে পড়তে মোটেই ভাল লাগে না তার। এই যে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া, এবং, কী কারণে ছেড়ে দেওয়া?—না, শুধু তার ভাল্লাগছে না বলে, এর মধ্যে তেমন কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেই। সে সত্যিসত্যি চেষ্টা করেছিল তেমন কোনও উচ্চবাচ্য না করে আর পাঁচজনের মত কোনরকমে অন্তত একটা বি. এস. সি হয়ে নিতে। পারল না। এই না পারার মধ্যে বৈপ্লবিকতা, হঠকারিতা, ঝুঁকি ইত্যাদি কিচ্ছু নেই। শুধু একটা না-পারাই আছে। একথা সত্যি, সে এখন কবিতা লেখে। বরাবর এই লেখালেখি তো তার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। কেউ জানতে পারেনি সেভাবে। হঠাৎ, সে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে যেন খানিকটা বিচ্যুত হল বলে, আর তার চারপাশে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেল বলেই, ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এই গোপন কথাটি। কেউ কেউ এমনও বলেছে, ছেলেটা কবিতা লেখার জন্যে পড়াশুনা চাকরির নিরাপদ বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে এল। তন্ময় জানে, এই রোমান্টিকতার কথা ভেবে সে এসব করেনি, আসলে, সে একজন দারুণ উচ্চাশাবিহীন মানুষ।

লোকে বলে, উচ্চাশা সাফল্যের প্রথম ধাপ। তা তন্ময়ের যেহেতু লোকের কথা শোনার অভ্যাস নেই, বস্তুত, সেই উদ্যমটুকুও নেই, সে এসব নিয়ে ভাবেনি কক্ষনো। কিন্তু সাফল্য এল। সাফল্যকে সাফল্য বলে বোঝার জ্ঞানগম্যিও তার ছিল না। কিন্তু লোকে এবার এত চিৎকার করল যে তার কানেও ঢুকল সেই হৈ চৈ। কলেজ যাওয়া নেই বলে

সারাদিন বাড়িতে বসে থাকা, থাকতে থাকতে সারাদিন কবিতা লেখা, সেই কবিতা দু'একজন সহিষ্ণু বন্ধুবান্ধবকে কালেভদ্রে শোনানো, এই তার জীবন বলে ভেবেছিল সে। ভেবেছিল, আপাতত যতদিন মা বেঁচে আছেন এবং চালু আছে বাপের হেঁসেল, সে এমনি করেই চালিয়ে যাবে। তারপরের কথা সে ভাবেনি। যেমন ভাবেনি, একদিন তার ঐসব কবিতা সে শুনিয়ে ফেলবে সদ্যপরিচিত আধ-খ্যাপাটে বছর যাটেক বয়সের অমলদাকে, যিনি নাকি পুরো খেপে যাবেন তার কবিতা শুনে। তার কবিতার খাতা ডানহাতে ছোঁ মেরে আর তন্ময়কে বাঁহাতে আঁকড়ে প্রায় টানতে টানতেই একদিন নিয়ে যাবেন মোহন বিশ্বাসের বাড়ি। মোহন বিশ্বাস, যাঁর আকাশছোঁয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বিত অবস্থান শুধু তাঁর অসামান্য লেখার জোরেই নয়, সেই এক নামী পত্রিকার সম্পাদনা-সূত্রেও। সেখানেও সে কবিতা শোনাবে প্রায় হতবিহ্বল যন্ত্রচালিতের মত এবং মাত্র দু'মাস পরে তাঁর সেই পত্রিকায় দেখবে একসঙ্গে তার তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এ ঘটনার পর তার সবিস্ময় আনন্দের ঘোর লাগবে একটা, কিন্তু সে জানবে না একে সাফল্য বলে কি না। অন্তত অন্যেরা জানবার আগে তো নয়ই। তারপর একটি প্রকাশনা সংস্থা নিজে থেকেই এগিয়ে আসবে তার বই ছাপানোর জন্যে। ততদিনে অনেক পত্রপত্রিকাই ক্রমাগত তার কবিতা বার করে চলেছে। সে এবার বুঝতে বাধ্য হবে একে বলে সাফল্য। তারপর সেই বই যখন পুরস্কৃত হয় এবং বেস্টসেলার লিস্টে বসে থাকে পরপর কয়েক সপ্তাহ, তখন সে একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবিম্বের হাত ছুঁয়ে বলে, আপনি আজকাল কেমন আছেন, তন্ময় বসু? আমাকে চিনতে পারছেন? আমি তনু...। প্রতিবিম্বের মুখ করুণ হয়ে আসছে দেখে তার হাসি পায়, খুব হাসি পায়।

এই মুহূর্তে লেখালিখির জগতে সবচাইতে বেশি প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা মোহন বিশ্বাসের। মোহন বিশ্বাস প্রায় এই জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর অক্ষর ও ধ্বনি দিয়ে। তন্ময়কে তিনি গ্রহণ করলেন, এবং, অতি নিপুণভাবে বিতরণ করতে শুরু করলেন জগৎসভায়। বিস্ময়ের প্রকোপে তন্ময়ের অসুখ করত, কিন্তু উপশমের একটা রাস্তাই তো সে জানে,—লেখা, লেখা, এবং আরো লেখা। একমাত্র লেখার সময়ই জগৎসংসার মুছে যায়। সে প্রাণপণে বধির হতে পারে, অন্ধ এবং স্পর্শজ্ঞানহীন, তাব সমস্ত ইন্দ্রিয় কী প্রবল সঙ্কুচিত হতে থাকে অন্তর্মুখে, ব্ল্যাকহোলের মত। ঐ তার একমাত্র পালাবার পথ ; গন্তব্যও। আর বাইরে সে ক্রমাগত খণ্ডিত হতে থাকল। তার টুকরোগুলো নিয়ে সবাই লোফালুফি করছে, সে দ্যাখে। একেকটা টুকরো একেকটা সভায় এসে পড়ে, একেকটা কবিতা পাঠের আসরে। সাক্ষাৎকারের বাজারে পেঁয়াজের খোসার মত উড়ে উড়ে বেড়ায় তার ত্বক। ঐ টুকরো আর খোসা, এ তো তার কিছু নয়, একথা সে নিজেকেই বলে।

এতৎসত্ত্বেও সে পালাতে পারে না যার থেকে, সে হল তার অপরাধবোধ। তার গৃহীত হওয়ার অপরাধ। একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে সজোরে গৃহীত হওয়ার যন্ত্রণা তাকে পাগল করে মারে। কিভাবে যেন, একেবারে কোনও সচেতনতা ছাড়াই, সে কী

দু'একটা কবিতা লিখে ফেলেছে, যেগুলো, বাজারী অর্থে ক্লিক করে গেছে তার মনে হয়। এর পিছনে তার সেই অর্থে গভীর কোনও মনস্কতা নেই ; একটা বোকাবোকা, শিশুসুলভ সততাই আছে শুধু। যে জন্যে, কবিতাগুলো লিখে তার কোনও গ্লানি নেই, এমনকি ছাপা হওয়া, বা, তারপরে কবিতাগুলোকে কেউ ভাল কেউ মন্দ বলার পরও তার নিজের মধ্যে অন্তত কোনও দ্বন্দ্ব আসেনি এতদিন। কারণ, সে কিছু জেনে লেখেনি, কিছু জানাবার জন্যেও নয়। সে শুধু তীব্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তার নিজের কথা লিখে গেছে। এর মধ্যে কোনও সভায় আসন পাওয়ার জোর বা তাগিদ কোনওটাই ছিল না তার। আজ সেই আসনে তাকে ঘাড় ধরে যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে হঠাৎ। কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা হচ্ছে যার উত্তর সে কিচ্ছু জানে না। সে তো কোনওদিন জানে বলে দাবীও করেনি! আর যখন প্রশ্ন করা হয় না, সে যখন এমনিই চুপ করে বসে থাকে, তার চারপাশে প্রচুর সচেতন দায়বদ্ধ পূর্ণাঙ্গ মানুষজন তাঁদের গভীর আলোচনায় অনায়াসে টেনে নেন তাকে, তার অজ্ঞানতার তোয়াক্কা না করে। মাঝে মাঝে এককেটা বাক্যের পর অর্থপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান তার দিকে, যেন একটা যথাযথ মন্তব্য প্রত্যাশা করে। কিন্তু তার কিছু বলার থাকে না। সে তো কোনওখানে কোনওদিন বলেনি তার এসমস্ত জানা আছে। এ তো তাঁরাই ধরে নিয়েছেন। আর সেই অপরাধবোধ এসে ছেঁকে ধরে তাকে। সমস্ত বিদগ্ধ গুঞ্জন ছাপিয়ে সেই এক তীক্ষ্ণ স্বর তাকে ভিতরে ভিতরে ফালাফালা করে দিয়ে বলে, এরা তোমায় যা ভাবছে তা তো তুমি নও। তুমি যে তা নও, এইবেলা সে কথা স্বীকার কর আর নেমে এসো অনধিকারের আসন থেকে। নইলে একদিন সেই লাঞ্ছনা হবে তোমার যার পিছনে তোমার কোনও দায়িত্ব ছিল না কোনওদিন। যেমন এই সম্মানের পিছনেও নেই...

এহেন পরবাসী তন্ময় একদিন সত্যিসত্যি পালাল। জীবনানন্দ শতবর্ষে তার সাহিত্যের আঁতুড়-আশ্রয় সেই নামী পত্রিকাটি যখন জীবনানন্দ ও তাঁর কাব্য বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখতে বলল, সে বলে দিল সে পারবে না। কারণ, সত্যিই, এ সম্বন্ধে কিছু লেখার যোগ্যতা তার নেই। সে চূড়ান্ত ডিপ্রেশনের সময় জীবনানন্দের কবিতার অক্ষরগুলো জিভ দিয়ে চেটে দেখেছে অশ্রুর মত নোনতা, এছাড়া তার আর কিছু লেখার ছিল না। পারমাণবিক বিস্ফোরণ বিরোধী একটি সভায় যাওয়ার জন্য তাকে টানাহেঁচড়া করেছিল যে সংস্থাটি তাদের সঙ্গে যথাসাধ্য দুর্ব্যবহার করল সে। কিন্তু তারা ভুলল না। বাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেল, তন্ময়ের গায়ে তখন অল্প জ্বর। সে প্রতিবাদের কবিতার বদলে, প্রতিবাদী কবিদের পাশাপাশি মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটানা চোদ্দটি ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা পড়েছিল। মঞ্চ থেকে যখন নামল তখন তার চোখ লাল, হাঁটু কাঁপছে, জ্বর বেড়ে এসেছে বিপদসীমার কাছে। ঐ কাণ্ডের পর তাকে কেউ বাড়িতে পৌঁছে দিতে আসেনি। তন্ময় একাএকা ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে হাহা করে কেঁদেছিল আর হেসেওছিল। বলেছিল, এই আমার পালানো শুরু হল...। ট্যাক্সিঅলা তার চেহারা ও আচরণ দেখেশুনে মাতাল ঠাওরেছিল তাকে। আর এগোতে অরাজি হয়েছিল। বলেছিল, নেমে যান। তন্ময়

দ্বিরুক্তি না করে ঠিকঠাক মিটারের টাকা গুনে দিয়ে নেমে এসেছিল। বাড়ি ফেরা হয়নি তার, কিন্তু নিজেকে সহসা এমন গৃহহীন মনে করে তার কেমন আরাম লেগেছিল।... পরবাসী থাকার চেয়ে গৃহহীনতাও কত সুখের...!

ট্যাক্সি থেকে নেমে বড়রাস্তার ধারে কোনও একটা শাটারফেলা বড় দোকানের সিঁড়িতে বসে ছিল সে, তারপর কখন এলিয়ে শুয়ে পড়েছে সে জানে না। ঘুম যখন ভেঙেছে তখন অনেক রাত্তির। জ্বর ছেড়ে গেছে, শরীর অত্যন্ত অবসন্ন। পাণ্ডুর হ্যালোজেন আলো অন্ধকার থেকে বেশি অস্বস্তিকর। চওড়া পিচরাস্তায় সেই আলো আর খানাখন্দের অন্ধকার মিলেমিশে ছড়িয়ে আছে আবর্জনার মত। এটা কোন রাস্তা তন্ময় চিনতে পারছে না। হয়ত চেনাই হবে। কিন্তু এই চেহারায় চেনা লাগছে না। সকাল হলে, দিনের আলোয় লোকজন বেরোলে, গাড়িঘোড়া চলতে শুরু করলে এই ভুতুড়ে শুনশান রাস্তাটাই পরিচিত হয়ে উঠতে পারে, সে জানে। আশ্চর্য! তার মধ্যে কি সেই পরিচয়ের অপেক্ষা আছে! লোকজন, চেনা চেহারা—এ সমস্তই কি তারও প্রয়োজন। সে তো দেখে এসেছে যাবতীয় স্থানে অস্থানে সে এক আজীবন বহিরাগত। সম্পর্কহীন বেমানান কেউ। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে সে তো মুক্ত হয়নি কক্ষনো! এখন এই অবাধ নিঃসঙ্গ রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা, এই জনহীন অবসর, এ সময়ে সে দিনের আলোর অপেক্ষা করছে কেন; লোক চলাচল শুরু হলে তার ভাল লাগতে পারে একি সত্যি? তন্ময় চারদিকে তাকায়। এতক্ষণ তার চোখে পড়েনি, ফুটপাতের ধারে একটা রাধাচূড়া গাছের নিচে আরও কিছু মানুষ শুয়ে আছে। মনে হয় যেন একটা পরিবার। ওদের ঘর কোথায়? তন্ময় জানে না, ভাবেও না। শুধু কেমন নিশ্চিন্ত লাগে তার। দুর্বল শরীর, তবু ঘুম আসবে না মনে হয়। কিন্তু শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করা যেতে পারে ঐ লোকগুলি কখন ঘুম ভেঙে উঠে বসবে। তখন তন্ময় যদি ওদের সঙ্গে চা খেতে চায় কোনও একটা চা-দোকানে গিয়ে, ওরা নিশ্চিত না বলবে না।

জন্মদিন

আজ নন্দিনীর জন্মদিন। কয়েকদিন আগে থাকতেই পার্থ প্রতিজ্ঞা করেছিল, আজ সে নন্দিনীকে নিয়ে কোথাও খেতে যাবে। এ বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা। পার্থ চোখ বুজে নিঃশব্দে উচ্চারণ করল—'হ্যাঁ, নন্দিনী। আজ আমি জিতব।'

নিঃশব্দেই বলতে হল কথাটা, কেননা নন্দিনী তার পাশেই শুয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে এখনও, তবে যেকোনও মুহূর্তে জেগে যেতে পারে। পার্থর ঘুমও এইমাত্র ভেঙেছে। এতক্ষণ সে শুয়ে শুয়ে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভাবছিল, এবার পায়ের দিকে দেয়ালঘড়িটার দিকে চোখ ফেলল। ছ'টা আঠাশ। দু'মিনিট অপেক্ষা করল সে। তারপব পাশ ফিরে নন্দিনীর কপালে ছোট্ট চুমু খেয়ে বলল—'নন্দরানী, ও নন্দরানী,....উঠে পড়ো সোনা, সাড়ে ছ'টা বাজে।' ইচ্ছে করেই এক্ষুনি কোনও উইশ করল না. সঠিক মুহূর্তটির আগে সে নন্দিনীকে জানতে দিতে চায় না যে, আজকের দিনটি তার মনে আছে। বস্তুতঃ, মনে মনে সে দিন গুণে অপেক্ষা করেছে এই দিনটির জন্যে। নন্দিনী সেকথা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলে সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ব্রেকফাস্টের মাখন পাঁউরুটি সামনে নিয়ে বেজার মুখে বসে ছিল পার্থ। সে ফাঁদ পাতছে। একটু পরেই নন্দিনী ফাঁদে ধরা দিল।

—'কী হল, খাচ্ছ না যে?'

—'ভাল্লাগছে না।'

—'কেন বল তো! শরীর টরীর খারাপ করল নাকি?'

নন্দিনীর স্বরে হাল্কা উদ্বেগ। পার্থ উৎসাহিত হয়ে মুখটাকে দ্বিগুণ উদাস করে তোলে।

—'নাহ্, শরীর নয়...'

নন্দিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপে চা ঢালছিল। টিপটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঘাড় ঝুঁকিয়ে গোটা শরীরটা প্রশ্নচিহ্নের মত বাঁকিয়ে ফেলল। একটু অধৈর্য স্বরে বলল—'তবে কী?'

পার্থর মুখ এখন ইচ্ছাকৃত করুণ। সে বায়নার সুরে বলে—'আমার খুব মনখারাপ লাগছে নন্দিনী। কয়েকদিন থেকেই এরকম হচ্ছে, জিভে স্বাদ পাচ্ছি না কোনও, চল, আজ সন্ধেবেলা চাইনিজ খেতে যাবে?'

বলেই নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে মনেমনে ঘাবড়ে গেল পার্থ। এতদূর অবধি সে

ঠিকঠাক অভিনয় চালাচ্ছিল, ওষুধও ধরছিল হিসেব মত। শেষটায় একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলল নাকি? আরও একটু খেলানো উচিত ছিল?

নন্দিনী সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সান্দিগ্ধ গলায় বলল—'বাড়ির খাবার ভালো লাগছে না? চাইনিজ খেলে মনখারাপ সেরে যাবে?'

—'তা...তা ঠিক জানি না।...মানে, চাইনিজ না খেয়ে অন্যকিছুও খাওয়া যেতে পারে.....'

—'অন্য কিছু কী?'

—'বলো, তোমার যা পছন্দ—'

পার্থ ঝুপ করে থেমে গেল। হয়ে গেল, প্ল্যানের দফারফা। নন্দিনীর মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সে মুখে এখন টকমিষ্টি হাসি।

—'ও! তাই বলো, আমাকে পছন্দ করতে হবে! কিন্তু আমার তো মনখারাপ করেনি।...জন্মদিনে কারও মনখারাপ করে?'

পার্থর মুখে কথা নেই, নিঃশব্দে সে এবার নিজেই নিজের মুণ্ডপাত করছে। তার অত সাধের প্ল্যান! তার দোষেই ডুবল—স্বখাত সলিল আর কাকে বলে!

নন্দিনী হেসে কুটিপাটি হচ্ছিল।

—'বাব্বা! কী অভিনয়টাই করলে,...আমার কিন্তু গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল—'

—'নন্দিনী!'

—'উঁ?'

—'হ্যাপি বার্থ ডে, সোনা!'

পার্থ চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। নন্দিনী তখনও খুব হাসছিল। হাসতে হাসতেই এগিয়ে এসে পার্থকে জড়িয়ে ধরল। তারপর হাসির মধ্যেই গুঁজে গুঁজে দিল কথাগুলো--

—' থ্যাঙ্কিউ....মিঃ শাহরুখ খান!'

পার্থও হাসে। ধরা পড়ে যাওয়ার পর সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। কে জানে, হয়ত নন্দিনী খেপে গেল। রেগে গেলে মাঝে মধ্যে নন্দিনীর নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না, চিৎকার চেঁচামেচি করে, জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি করে, পার্থকে খিমচে টিমচেও দিয়েছে দু'একবার। কিন্তু এখন তার মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই। ঝরঝর করে অনর্গল হেসে চলেছে। পার্থর খুব আনন্দ হয়। একটু সাহসও পেয়ে যায় সে। নন্দিনীকে জড়িয়ে থেকেই তার কাঁধে মুখ রেখে বলে—'প্লিজ নন্দিনী, চলো না...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নন্দিনী ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল। সে আর হাসছে না, রাগ চেপে মুখটাকে হাসিহাসি রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। পার্থর ধাক্কা লেগেছিল, কিন্তু মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল—

—'প্লিজ, প্লিজ সোনা, আজকের দিনটা!'

—'না। বাইরে খাওয়ার অনেক খরচ। আমি বাড়িতে রান্না করব। আমার জন্যে একদম বাজে খরচ করবে না।'

নন্দিনী ছিট্‌কে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পার্থ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, ঠোঁটের মধ্যেই উচ্চারিত হয়—'ঈশ্বর!'

পার্থ আজ ভোরবেলার কথা ভাবছিল। তার প্রতিজ্ঞার কথা। আশ্চর্য, এখনও সে এইসব স্বপ্ন দ্যাখে কেন! আজ তিনবছর হয়ে গেল, সে কোনওদিন এ ব্যাপারে কৃতকার্য হয়নি, তবু সে নিজের সাথে এই চ্যালেঞ্জে নিজেই জড়ায় কেন বারবার। ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তো কম শক্তির দরকার হয় না, এত শক্তি সে পায় কোত্থেকে!

তাছাড়া, এই ব্যাপারটাকে সে তো গুরুত্বই না দিতে পারে। এগুলোকে আমল না দিলে, তার আর নন্দিনীর মধ্যে সম্পর্ক এমনিতে দারুণ ভালো। তিনবছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। দেখাশুনো করে বিয়ে, কিন্তু পার্থ নন্দিনীকে বিয়ের আগে চিনত। পার্থর বাবা প্রতিষ্ঠিত উকিল, নন্দিনীর বাবা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মক্কেল। বিয়ের সম্বন্ধ যখন উঠল, সব দিক থেকেই পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটে গেল খুব মসৃণভাবে। নন্দিনীর বিয়ের আগে কোনও প্রেম ছিল না। পার্থর একটিমাত্র প্রেমিকা তার দু'বছর আগেই বিয়ে করে কানাডা পাড়ি দিয়েছে। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর পার্থ নন্দিনীকে নিয়ে দু'মাসে তিনটে সিনেমা দেখেছিল, দু'দিন রেস্তোরাঁয় খেয়েছিল—দু'দিনই চাইনিজ। বিয়ের পর এই তিন বছরে তারা একটাও সিনেমা দ্যাখেনি। খাওয়ার কথা উঠলে আজ সকালের দৃশ্যই নানান ছাঁদে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার মঞ্চস্থ হয়েছে।

এর কারণ, নন্দিনীর এক অদ্ভুত কমপ্লেক্স। সে তার জন্যে পার্থকে একপয়সাও বাড়তি খরচ করতে দেবে না। পার্থ একাএকা কিংবা অন্য যে কারও সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখলে, খাওয়াদাওয়া করলে, বেড়ালে, তার কোনও আপত্তি থাকে না। এমনকি পার্থ যদি বেহিসেবী টাকা ওড়ায়, অথবা দেদার দানধ্যান করে, নন্দিনীর মনে কোনও রেখাপাত করে না। তার মানে অবশ্য এও নয় যে সে সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। বরং, পার্থ প্রায়ই নতুন করে অবাক হয় তার নিপুণ গৃহিণীপনায়। প্রয়োজন না থাকলেও রান্নাবান্না সব নন্দিনী নিজের হাতেই করে। নাম-কা-ওয়াস্তে কাজের মেয়ে আছে একটি, নন্দিনী কেবলমাত্র ঘরমোছা আর বাসনমাজাটাই তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। আর আছে তার গাছ। দক্ষিণের বারান্দায় দুটো দু'রঙের নয়নতারা, একটা সন্ধ্যামণি, একটা জবা। কেনা নয়, কাজের মেয়েটিকে দিয়ে সংগ্রহ করা। নয়নতারা আর সন্ধ্যামণির চারা তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, জবাগাছটিও পাশের বাড়ির বাগান থেকে কেটে ফেলা ডাল পুঁতে তৈরি। নন্দিনীর যত্নে এরা গাছ আলো করে ফুল দ্যায়, কিন্তু কারও গন্ধ নেই। পার্থ একদিন কথাটা বলেছিল—'তোমার সুগন্ধি ফুল পছন্দ নয়? নন্দিনী মুচকি হেসে বলল—'পছন্দ নয় কে বলল, দাঁড়াও না, একটা জুঁই লাগাব টবে। মেজমাসির বাড়িতে আছে। বর্ষাকালে ওর শেকড় থেকে অনেক চারা বেরোয়, একটা নিয়ে আসব...'

পার্থ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। বুঝেছিল, নন্দিনীকে গাছ কেনার কথা বলা বৃথা। তার শখের জন্য টাকার অপচয় সে সহ্য করবে না। সেই বর্ষাকাল চলে গেল, বারান্দায় কোনও নতুন গাছ এল না। হয়ত মাসির বাগানে এবছর কোনও চারা হয়নি,—পার্থ এব্যাপারে আর কিছু জিগ্যেস করেনি।

গৃহস্থালী সামলিয়ে পার্থর দেখভাল করতেও নন্দিনীর উৎসাহে কোনও কমতি নেই। একটা সতেজ আন্তরিকতায় সবসময়ই সে টলটল করছে। শুধু এই কয়েকটি বিশেষ সময় ছাড়া। যখন সে বুঝতে পারে পার্থ তার জন্যে পয়সা খরচ করছে। হনিমুনে পাঁচমারিতে গিয়েও নন্দিনী ঝুলোঝুলি করেছিল একটা সস্তা হোটেলে থাকার জন্যে। শেষে পার্থর অসুবিধে হবে ভেবে আর জোর করেনি। কিন্তু তারপর এই তিনবছরে পার্থ অফিসের ট্যুরে দু'বার বাইরে গেছে, নন্দিনী সঙ্গে যেতে রাজি হয়নি।

বিয়ের পর প্রথম যেদিন পার্থ তার জন্যে উপহার এনেছিল, ঘন নীল একটা ঢাকাই জামদানি, অফিস থেকে ফিরে শাড়ির প্যাকেটটা নন্দিনীর হাতে দিয়ে তীব্র উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল বউ-এর হাসি দেখবে বলে। নন্দিনীর মুখ কিন্তু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যেন খুব আঘাত পেয়েছে সে। কাঠের পুতুলের মত পার্থর দিকে তাকিয়ে বলল—'কী এটা!'

—'খুলে দ্যাখো! আমার অসাধারণ বউ-এর জন্যে প্রথম সামান্য উপহার।' পার্থ ঝলমল করছিল। উপহার দিয়েই তার এত আনন্দ হচ্ছিল, যে, উপহার পেয়ে আরেকজনের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সে ঠিক খেয়াল করেনি। তার মাথায় কড়াৎ করে লাগল, যখন শুনল নন্দিনী ফ্যাঁসফেঁসে শুকনো গলায় বলছে—

—'কেন এনেছ, এর তো অনেক দাম'

পার্থ অবাক হয়ে গিয়েছিল,—'দাম! তা হোক না। আমি এনেছি তোমার জন্যে—তুমি তো দেখলেই না এখনও। অবশ্য, পছন্দ না হতে পারে...'

বলতে বলতে মোড়ক খুলে শাড়ি বার করে ফেলেছিল সে। ঘন নীলের ওপর রং দার অজস্র বুটি। বিছানার ওপর ভাঁজ খুলে শাড়িটাকে বিছিয়ে দিয়ে নিজেই সে চোখ ফেরাতে পারছিল না ; নন্দিনীর এই শাড়ি পছন্দ হবেনা এ হতেই পারে না। বিশেষ করে সে যখন জানে, নন্দিনীর প্রিয় রং এই জাহাজ নীল! পার্থ ব্যাকুল হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নন্দিনীর দিকে তাকাল, অবিশ্বাসের সুরে বলল—'দ্যাখো, ভালো না?'

নন্দিনীর মুখে কোনও জ্যোতি নেই। সে অন্যমনস্কভাবে শাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। শূন্য দৃষ্টি। তাকে রীতিমত অসুস্থ দেখাচ্ছিল। পার্থর যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল সব। কিন্তু সে আর কিছু জিগ্যেস করার আগেই নন্দিনী কেটে কেটে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল—'আমার উপহার ভালো লাগে না। আমার জন্যে বাজে খরচ করবে না।'

পার্থ বিস্ময়ে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। এ কী হল! তবে কি তাদের দাম্পত্যে এরই মধ্যে চিড় ধরেছে কোথাও, সে বুঝতেই পারে নি? পার্থর সত্যিই মনে হয়েছিল তার মাথার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাক খাচ্ছে।

একটু পরে নন্দিনী যখন কফি আর চিঁড়ের পোলাও নিয়ে ঘরে ঢুকল, পার্থ তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। কিন্তু নন্দিনী সহজভাবেই বলল—'জামাকাপড় পরে ছেড়ো। আগে খেয়ে নাও। শাড়ি আমি তুলে রাখছি। কিন্তু আমাকে আর কখনও কিছু দিও না, আমার অসুবিধে হয়।'

পার্থ বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে কাছে এসে তার মাথাটা টেনে নিয়েছিল বুকে। চুলে বিলি কাটতে কাটতে নিবিড় গলায় বলেছিল—'আমাকে ভুল বুঝো না। ভেবে নিও, এই একটাই আমাব দোষ...কিংবা পাগলামি.....'

পার্থর কাছে গোটা ব্যাপারটাই হেঁয়ালি ঠেকেছিল। কিন্তু দামী উপহার সে আর আনেনি কখনও। ক্রমে আজকাল কেনাকাটা করাও একরকম ছেড়েই দিয়েছে সে। এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস নন্দিনীই কেনে। তাছাড়া কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিসও কেনে পার্থর জন্যে। একবার তার পুরনো কিন্তু অক্ষত একজোড়া পলিথিনের চপ্পল থাকা সত্ত্বেও বর্ষার মুখে সান্দাকের নতুন মডেলের জুতো কিনে নিয়ে এল নন্দিনী। পার্থ কিছু বলতে যেতেই নন্দিনী হাসল,—'এটা কিন্তু উপহার নয়। তোমারই টাকায় কেনা। আর উপহার হলেই বা কী হত, তুমি তো আর আমার মত ছিট্‌গ্রস্ত নও!'

'তোমার টাকা' —কথাটা নন্দিনী সবসময় ব্যবহার করে। আগে পার্থর কানে লাগত, এখন তার কানের পর্দা মোটা হয়ে গেছে। নন্দিনী সবসময় মনে রাখে তার কোনও আলাদা উপার্জন নেই, সংসার চলে পার্থর আয়ে। অথচ তার ফিজিক্সে ভাল ডিগ্রি রয়েছে, ইচ্ছে করলে চাকরি জোগাড় করা অসম্ভব নয়। পার্থ একদিন বলেছিল—'বেশ, আমার টাকা যদি এতই অচ্ছুত, চাকরি করলে তো পার। আমার তো আপত্তি নেই!'

—'তোমার আপত্তির তোয়াক্কা কে করে?' নন্দিনীর ঝাঁঝালা উত্তর,—'আমি চাকরি করি না সংসার করাব জন্যে। চাকরি করলে আমার রান্নাবান্না ঘরের কাজ করার সময় হবে না। কিন্তু আমি এটাই ভালবাসি, করতে চাই।' বলেই সে পার্থর দিকে চোখ সরু করে তাকালো—'কেন বলুন তো? আপনার কি ধারণা হয়েছে আমি বসে খাই? আজ্ঞে না, আমি রান্না করি, ঘর সাফ করি, কাপড় কাচি, ইস্ত্রি করি—'

—'ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্' পার্থ অস্থির হয়ে পড়েছিল, —'আর বলতে হবে না, আমি জানি। কিন্তু কেন নন্দিনী! কেন এত খাটো তুমি সংসারের পেছনে, আমরা তো এগুলো লোক দিয়ে করিয়ে নিতে পারি..'

—'না, তাহলে তোমারও ভালো লাগবে না, আর আমারও মনে হবে আমি বসে বসে তোমার পয়সায় খাচ্ছি।'

—'স্টপ ইট নন্দিনী। কেন তখন থেকে কতগুলো আজেবাজে কথা বলছ?'

নন্দিনী উঠে এসে পার্থকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রাখল।

—'আই লাভ ইউ পার্থ, লেট মি শো ইট।'

—'কিন্তু আমিও তো তোমাকে ভালবাসি, কই আমাকে তো কিছু করতে দাও না

তুমি?'

—'তুমি অনেক কর, আর কিছু করার দরকার নেই। আমি জানি তুমি ভীষণ ভালবাসো...'

—'আর আমি বুঝি জানি না?'

পার্থ তর্ক চালাতে তৈরি ছিল। নন্দিনী উঠে বসে তার চোখের দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন দিঘির তলের বালি দেখছে, আস্তে আস্তে বলল—'কী জানি!'

এর পরে আর কোনও কথা চলে না। মানুষ যখন কাউকে ভালবাসে, সেকথা জানানোর জন্যে সে কত কিছুই করতে পারে। কিন্তু তার প্রতি আরেকজনের ভালোবাসার কথা যে সে জানে, একথা বিশ্বাস করানোর জন্য ঠিক কী করতে হয়, তা নির্ণয় করা মুশকিল। অন্তত, পার্থ আর কিছু ভেবে পায় না, এক শুধু চুপচাপ নন্দিনীর ইচ্ছে অনিচ্ছের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া ছাড়া।

গত তিনবছরে দামী উপহার নয়, নন্দিনীকে জন্মদিনে সামান্য ফুল কিংবা কার্ড দিতে গিয়েও প্রতিহত হয়েছে পার্থ। এটুকুও নন্দিনী মেনে নিতে পারেনি। অথচ পার্থর জন্মদিনে কিন্তু এ নিয়ম খাটেনি। অবশ্য, নন্দিনী তার জন্যে কিছু কেনেনি। একবার দিয়েছিল নিজের হাতে বোনা গরম উলের লাল টুকটুকে জাম্পার, একবার আগাগোড়া ঘরে সেলাই করা কাঁথাস্টিচের নকশাতোলা পাঞ্জাবি। তৃতীয়বার দিয়েছে একটা অ্যাশট্রে, আস্ত কাঠ কুঁদে অসীম নিপুণতায় সেটাকে গড়ে তুলেছিল নন্দিনী। এটা বানাতে গিয়ে নিজের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতাকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছিল সে। তৃপ্ত আনন্দিত মুখে সে পার্থর হাতে যখন উপহারটা রাখল, পার্থ রুদ্ধস্বরে বলেছিল—

—'অসাধারণ, নন্দিনী, অসাধারণ! আমি এর যোগ্য নই। কোনও একজিবিশনে দিলে এর কত দাম উঠত জানো?'

—'ওটা অমূল্য', সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়েছিল নন্দিনী,—'কিনে দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই, তাই বানিয়ে দিয়েছি।'

পার্থ কিছু বানিয়ে দিতে পারে না। তার সে ক্ষমতা নেই। সে চুপচাপ হার মেনেছে। শুধু বছরে দু'তিনবার এখনও সে নন্দিনীর সঙ্গে বাইরে গিয়ে খাওয়ার প্রস্তাব করে, এবং অনিবার্য ফলভোগ করে। আসলে, সে নন্দিনীকে সংসারের স্বেচ্ছাসৃষ্ট চাপ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বার করে নিয়ে যেতে চায়। আজ পার্থ ভাবল, আর না, এবার সে এ আশাও চিরদিনের মত ছাড়বে।

একথা সে ভাবল বটে, কিন্তু অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হতে, নন্দিনীর সঙ্গে রোজকার সাংসারিক কথাবার্তা বলতে বলতে পার্থ গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রইল। নন্দিনীর এই আচরণের পেছনে নিশ্চিত কোনও কারণ আছে, সেটা তাকে খুঁজে বার করতে হবে। মনে হতে পারে এই আপাত-অর্থহীন প্রতিক্রিয়াগুলো তার তাৎক্ষণিক

পাগলামি। কিন্তু আসলে তো তা নয়। বিয়ের আগে যে দু'মাস তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশেছিল, নন্দিনী তখন তার সঙ্গে সিনেমায় গেছে, বাইরে খেয়েওছে। যদিও তাকে মনে হত একটু আড়ষ্ট, তবে সেটা খুব অস্বাভাবিক দেখাত না। বিয়ের পরেও অন্য সমস্ত দিক থেকে নন্দিনী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তার সঙ্গে ভীষণ সুখী দাম্পত্য সম্পর্ক, মেয়ে হিসেবে নন্দিনী অসাধারণ গুণী, তার মন আর স্বভাবও দারুণ সুন্দর। শুধু ঐ একটি কমপ্লেক্স যেন মুসুরির ডালে এক চামচ চিনি, সমস্ত সুস্বাদ নষ্ট করে দিতে যথেষ্ট। ঐ কমপ্লেক্সই তার মধ্যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে তাকে মাঝে মধ্যে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দুমড়ে দিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে রহস্যটা কী?

শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে পার্থর সম্পর্ক খুবই ফর্মাল। বছরে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে ছাড়া দেখা সাক্ষাতও প্রায় হয় না। নন্দিনীও এ ব্যাপারে জোর করে না। ওর কারণেই সম্পর্ক, ওরই মাধ্যমে যোগাযোগ। আজ পার্থ অফিসে গিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফোন করল।

ফোন ধরেছিলেন শাশুড়ি। পার্থর গলা শুনে কোনও দুঃসংবাদ আশঙ্কা করে প্রথমে ঘাবড়ে গেছিলেন। পার্থ তাঁকে আশ্বস্ত করল। তারপর বলল, আজ অফিস থেকে বেরিয়ে দুপুর নাগাদ সে একটু দেখা করতে যাবে।

শ্বশুরবাড়ি কলেজ স্ট্রিটে। সেখানে গিয়ে খানিকটা একথা ওকথার পর পার্থ আজ সকালের ঘটনাটা বলল। তার আগের সমস্ত ঘটনাও। শ্বশুর-শাশুড়ি নিঃশব্দে শুনছিলেন। পার্থ বলল—'তিনবছর ধরেই এই চলছে। আমার খুব কষ্ট হয় ও এমন করলে। আজ হঠাৎ মনে হল, এর পেছনে কি ওরও কোনও কষ্টের অভিজ্ঞতাই কাজ করে?'

নন্দিনীর মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,

—'সেরকম কোনও কষ্ট ওর আছে কি না সে তো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে...মনে হয়....এ আমারই দোষ।'

—'আপনার দোষ?'

—'হ্যাঁ বাবা, তাই মনে হচ্ছে। ওর বাবার সঙ্গেও আমি শেষদিকে এই একই ব্যবহার করতাম, ও সেটা দেখেছে তো।'

—'কিন্তু কেন?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর নন্দিনীর মা অন্যদিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললেন—'কেন, সে আর কী বলব তোমাকে...তোমরা এসব জানোও না, বুঝবেও না। উনি সারাজীবন আমাকে যেভাবে ট্রিট করে এসেছেন, ঝি-এরও অধম। সংসার খরচ সব চিরদিন ওঁর হাতে, সংসারের প্রয়োজনেই কখনও একটা পয়সা চাইলে বাড়িতে মারদাঙ্গা হত। বাইরের লোককে আর কী বলি বল, কোনও দিন হাতে করে বাড়ির কারুর জন্যে কিছু আনেননি, অথচ জানো তো কত বড় চাকরি করেছেন।' তাঁর মুখে একইসঙ্গে বিতৃষ্ণা আর দুঃখ ফুটে উঠছিল। একটু থেমে বললেন—'এখন বয়স হয়ে গিয়েও স্বভাব

বদলায়নি, তবে শরীর অথর্ব হয়ে পড়েছে বলে আগের মত ডাণ্ডা ঘোরাতে পারেন না,এই যা। আমি ওঁর টাকা ছুঁই না। নন্দি সব জানে।...কিন্তু ও তোমার সঙ্গে এমন করে কেন? এটাও তো অন্যায়। তোমার তো ওর বাপের মত স্বভাব নয়!'

পার্থ শঙ্কিত আড়চোখে শ্বশুরের দিকে দেখেছিল। জবুথবু হয়ে বসে আছেন আরামকেদারায়, একটাও কথা বলেননি। পার্থর অস্বস্তি দেখে নন্দিনীর মা হাসলেন, বললেন—'একেবারেই শুনতে পান না আজকাল, নন্দিনী বলে নি?'

শ্বশুরবাড়ি থেকে অফিসে ফিরে গিয়েও কাজে মন দিতে পারেনি পার্থ। এতসব কথা সে জানত না, হয়ত জানার কথাও নয়। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, জানা উচিত ছিল। নন্দিনী বাপের বাড়ির কথা, তার নিজের কথা কিছুই বলে না। কিন্তু ছোটবেলা থেকে দেখে আসা মা-বাবার ভেতরে অশান্তি, বাড়িতে মায়ের অপমানিত অবস্থান, তার মনটাকে একদিক থেকে আশঙ্কায় বিকৃত করে দিয়েছে। পয়সার জন্যে পাছে আত্মসম্মান খোয়াতে হয়, এই অবচেতন ভয় তার মনের গভীরে এমন ঢুকে গেছে যে আজ তাকে উপড়ানো প্রায় অসম্ভব। তার আরও কষ্ট এই জন্যে, যে, আজকালকার আর পাঁচটা মেয়ের মত সে চাকরি করতে চায় না, তার মায়ের মতই সংসার করতে চায়।

অফিস থেকে বেরিয়ে পার্থ এলোমেলো হাঁটছিল, তার মনের মধ্যে ওলটপালট চলছে। সে এতদিন নন্দিনীকে ভয় পেয়ে এসেছে তার আজগুবি মেজাজের জন্যে, তার আকস্মিক অপ্রত্যাশিত কাঠিন্য তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। এখন সে বুঝতে পারছে সে তার কত বড় ভুল। একজন ভীতকে দেখে ভয় পেয়েছে সে, অথচ তার কর্তব্য ছিল তাকে সাহস জোগানো। শুশ্রূষার বদলে সে নিজেই ছটফট করেছে এতদিন....

পার্থ মনস্থির করে ফেলল। আজ নন্দিনীকে জন্মদিনের উপহার সে দেবেই। তার ইচ্ছামত উপহার। নন্দিনী রেগে যাবে, রাগুক। ও তার রাগ নয়। ভয়। ঐ ভয় দেখে পার্থ আর ভয় পাবে না। তাহলেই একদিন সে এই অমূলক ভয় ভাঙতে পারবে। কিন্তু কী উপহার দেবে সে? শাড়ি?—উঁহু। ছোটখাটো গয়না কোনও?—না। বই?—তাও না। পার্থ হাতড়াতে থাকে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে ফুটপাথের কোণে ছোট মাটির টবে ছোট ছোট সবুজ সবুজ চারা। পার্থ নিজের অজান্তেই সেদিকে এগোয়। রোগা কালো লোকটি বিড়ি টানছিল। সচকিত হয়ে ওঠে—'বলুন বাবু। নিয়ে যান, খুব ভালো জাতের জুঁই বেল চামেলি...'

—'ফুল কবে ফুটবে?'

—'ফুটবে, ফুটবে বাবু। ঘরে নিয়ে গিয়ে যত্ন করুন, ধৈর্য ধরুন। ফুল আসবে। গাছ করাই কষ্টের বাবু, ফুল ফোটা তো কেবল সময়ের ব্যাপার, ...কোনটে দেব?'

পার্থ মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে—'জুঁই'।

লোকটা সাবধানে একটা খবরের কাগজ দিয়ে টবটা মুড়তে থাকে। পার্থ তাকিয়ে

থাকে স্বপ্নাবিষ্টের মত। আজ এটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটবে তা মোটামুটি তার মুখস্থ। কিন্তু ও এখন সেকথা ভাবছে না। ওর চোখের সামনে এখন একটা ফুটন্ত জুঁই গাছের ঝাড়, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে রাখা। বারান্দায় বৃষ্টি নেমেছে, জুঁইগাছ ভিজছে, কোনও আপত্তি করছে না। তার খুশি খুশি ফুলগুলি থেকে ভিজে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে...

রেলগাড়ি

বিছানায় শোয়া থেকে ঘুম আসা অবধি একটা অদ্ভুত সময়। শরীর আর মন যে দুটো আলাদা জিনিস, এই সময় বোঝা যায়। আনোয়ার বুঝতে পারে। তার শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চায়, মনটা তখনও জেগে থাকে। শরীরটাকে তখন কেমন দশমনি পাথরের মত লাগে, কিংবা পাথরে ভরা একটা মাঠ, কিংবা ঐ মাঠের ধারে একটা ফাঁকা স্টেশন। আর তার মনটা একটা রেলগাড়ি হয়ে যায়। ছবির পরে ছবি, কথার পরে কথা, ভাবনার পর ভাবনা জুড়ে জুড়ে বিরাট লম্বা রেলগাড়ি, ঝক্ ঝক্ করতে করতে স্টেশন ছেড়ে অনেক দূর চলে যেতে থাকে। একেকবার ভাঙা ভাঙা স্বরে তীব্র হুইস্‌ল্ দ্যায়, আনোয়ারের হাত-পাগুলো ঘুমের ঝোঁকে কেমন কেঁপে ওঠে, ছটফটিয়ে ওঠে।

রেলগাড়িটা আজকাল কেবলই বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছে। ছুটছে না তো, পালাচ্ছে। গাড়ির আশেপাশে ছুটন্ত কিছু মানুষও যেন অস্পষ্ট দেখা যায়। তাদের হাতে টাঙি, বর্শা আর ঝাণ্ডা। ঘুমোতে ঘুমোতেই আনোয়ারের গলার মধ্যে হাঁকপাক করে। তার শরীর খিদিরপুরের বস্তিতে ঘুমোয়, মনের রেলগাড়িটা কখন যেন হুশ্ করে কেশরগঞ্জে পৌঁছে যায়, আবার সেখান থেকেই পালাতে শুরু করে।

তাই বলে আনোয়ারের মাঝরাতে ঘুম ভাঙেনা কখনও। ঘুমিয়ে পড়লে তার বরাবর এক ঘুমে রাত কাবার। রেলগাড়িটা ছোটাছুটি করতে করতেই একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। তারপর সব চুপচাপ। সকালে ঘুম থেকে উঠে আনোয়ার নাস্তাপানি সেরে নিয়ে দোকানের দিকে হাঁটা দ্যায়। রোজ ন'টার সময় দোকান খুলে ফ্যালে সে। ক্যামাক স্ট্রিটে চাউমিন আর রোলের দোকান, তার নিজের নয় অবশ্য। অফিসপাড়ার এক বাবু কিনে তাকে চালাতে দিয়েছেন। ঐ অঞ্চলের অফিসবাবুদের অনেকেরই এমন সাইড বিজনেস আছে। হ্যাপা নেই, লাভ আছে। আনোয়ারের মালিক ভালমানুষ, পাইপয়সার হিসেব রাখেন না। দোকান থেকে মাসে দু-তিন হাজার মত তুলতে পারলেই সন্তুষ্ট। বাকিটা আনোয়ারের। তা তারও মাসে ভালই থাকে, দোকান রমরমিয়ে চলে, সে আসার পর বিক্রিবাটা বেড়েছে। মালিক সেকথা নিজেই স্বীকার করেছেন। আনোয়ার দোকানের পুরনো নাম বদলে নতুন নাম রেখেছে নূরজাহান রোল সেন্টার। মালিক আপত্তি করেননি।

এসব মাত্র মাস আষ্টেকের ঘটনা। কেশরগঞ্জে দাঙ্গা বাধলে আনোয়ার তখনই পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। এ দাঙ্গা হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নয়, রাজনৈতিক দাঙ্গা। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল কয়েকদিনে। যারা প্রাণে বেঁচেছিল, আনোয়ারেরা কয়েক ঘর, বাড়িঘর ফেলে রেখে সবাই পাশের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। রাতের বেলায় আলে

আলে পাহারা চলত। সকাল হলে দেখা যেত আলের ওপরেই গুলি-খাওয়া লাশ পড়ে আছে। রক্তের ধারা মিশেছে পাশের নাবাল ক্ষেতে। আনোয়ারেব মা কেঁদেকেটে ছেলেকে পাঠিয়ে দিল শহরে, খিদিরপুরে তার কে চেনা লোক আছে, তার কাছে। আনোয়ার কোনও দলে ছিল না, পালিয়ে আসা ছাড়া তার কিছু করারও ছিল না। রাজনীতি কর চাই না কর, দাঙ্গা বাধলে জোয়ান ছেলেরাই আগে মরে।

খিদিরপুরে এসে মায়ের চেনা লোককে সে খুঁজে বের করতে পারেনি, তবে মাথা খোঁজার আশ্রয় মিলে গেছে। বস্তিতেই, তবে পাকা ঘর, মাথায় টালির চাল। সোরাব আলির বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া মিলেছে দুশো টাকায়। এখানে আসার পর মাসখানেক অবশ্য ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছে আনোয়ার। কাজের ধান্দায়। আসার সময় মা একটা রুপোর খাড়ু দিয়েছিল হাতে। ঐ ভাঙিয়ে শেষকালে আর যখন চলে না, বাড়িঅলা সোরাব আলিই সন্ধান দিল কাজের। সে মল্লিকবাজারে একটা গ্যারেজের হেড মেকানিক। গাড়িঅলা লোকেদের সঙ্গে আলাপ। একজন তার কাছে খোঁজ করেছিলেন খাবারের দোকান চালাবার মত কাউকে সে দিতে পারবে কিনা। সোরাব আলি আর দেরি করেনি, তার বাড়ি ভাড়া আটকে যাওয়ার আশঙ্কা তো ছিলই।

ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসপাড়ায় পাশাপাশি সব দোকান। বেশিরভাগই রোল চাউমিনের। ইডলি দোসা কচুরি তরকারি মিষ্টিও আছে কিছুকিছু। কঠিন প্রতিযোগিতা, কিন্তু মন্দ চলে না কারুরই। চারপাশে বিরাট উঁচু উঁচু বিল্ডিং, তার পেটের মধ্যে যে কত লোক, মালুম পড়ে দুপুরবেলায়। চাকভাঙ্গা বোলতার মত ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ বেরিয়ে এসে খাবারের দোকানগুলোকে ছেঁকে ধরে। সেসময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে যন্ত্রের মত কাজ করে যেতে পারলেই হু হু করে বিক্রি। যে যত তাড়াতাড়ি হাত চালাবে তার ততই লাভ। এ ক'মাস আনোয়ার একাহাতেই সব সামাল দিয়েছে, এবার তার মনে হচ্ছে মালিককে বলে একটা বাচ্চা 'হেল্পিং হ্যান্ড' রাখা দরকার। পাশের দোকান রতন সাহার 'পথের সাথী'তে যেমন আছে। 'হেল্পিং হ্যান্ড' কথাটা আনোয়ার রতনেব কাছেই শিখেছে।

সন্ধে আটটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে আনোয়ার ঘরে ফিরছিল। তার হাতে একটা কালো প্লাস্টিকের প্যাকেট, তার মধ্যে গোটা তিনেক রোল। সদ্য গড়া, সদ্য ভাজা। আনোয়ার রোল নিয়ে ঘরে ফিরছে নিজে খাওয়ার জন্যে নয়, বিক্রির জন্যে তো নয়ই। গতকালই সে রুকসানাকে কথা দিয়েছিল আজ তাকে রোল খাওয়াবে। অবশ্য রুকসানাকে কথা দিতে হয় না, মাসে দু'দিন সে নিজেই কথা আদায় করে নেয়।

সোরাব আলির মেয়ে রুকসানা। পাঁচবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, বয়েস পনের ষোলো। সোরাবের ছেলে নেই। ছোটটা ছাড়া বাকি মেয়েগুলোর বিয়েশাদি দেওয়া সারা। ছোটর আগেরটার বিয়ে দিল এই সেদিন, আনোয়ার আসার পর। রুকসানারও বিয়ের বয়স হয়েছে, সোরাব পাত্রের তালাশও লাগিয়েছে, তবে নিয়মমত মেয়েকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। রুকসানা জেদ করে পড়া ছাড়েনি, কাছাকাছি মেয়ে-স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ছে।

আনোয়ারকে চুপিচুপি বলেছে, মাধ্যমিক পাশ করবার আগে সে বিয়ে করবেই না।

আনোয়ারের চমক লাগে। তার নিজের বিদ্যে ক্লাস ফোর অবধি। তার ওপর গ্রামের ছেলে। রুকসানার চকচকে চেহারা, চুলের রংবেরঙের ক্লিপ, নখের রং, সর্বোপরি তার মুখে সাফসুতরো হাসি আর পড়ালেখার গল্প শুনে আনোয়ারের বুক শিরশির করে। সকালে স্কুল যাওয়ার আগে রুকসানা তার ঘরের দরজা ধরে প্রায়ই দাঁড়ায়। বলে,

—'কী গো রোলঅলা, ব্যবসা কেমন চলছে আপনার?'

—'হুঁ, আমার ব্যবসা না আরও কিছু, লোকের চাকরি করি, দোকান কি আমার?'

—'আপনার না তো কী? যেমন ইচ্ছে রোল বানানো, চাউমিন বানানো, যেমন ইচ্ছে বিক্রি, যেমন ইচ্ছে খাওয়া....' রুকসানা বেণী দুলিয়ে খিলখিল করে হাসে। আনোয়ার আড়চোখে হাসি দ্যাখে। সোজা তাকাতে ভয় হয় তার। রুকসানা আবার বলে —'বলুন না ও রোলঅলা, কাল ক'টা রোল খেলেন?'

—'তোমার মনে হয় দোকানের খাবার সব আমি খাই?'

—'তাছাড়া আর কী! আমাদের কি দ্যান একটাও!'

আনোয়ার হাল ছেড়ে দিয়ে হেসে ফ্যালে। এই পড়াশুনো করা মেয়ের সঙ্গে কথায় সে পারবে কেন! তবে হেরে সুখই হয় তার। আরও সুখ হয় রুকসানার কথা ভেবে হাতে করে খাবার জিনিস আনতে। তবে মাসে ঐ দু'দিনের বেশি নয়, বাড়াবাড়ি করলে শেযে কী কথা উঠবে। রুকসানাও তার বেশি কিছু বলে না। প্যাকেট হাতে নিয়ে তার চকচকে কালো চোখে হাসি ঠিকরে ওঠে। রুকসানা সুর্মা লাগায় না, আনোয়ার দেখেছে। মাঝেমধ্যে সাজগোজ করলে চোখের ওপরের পাতায় কালো রঙের দাগ টানে।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢোকার আগে উঠোনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিল আনোয়ার। সোরাবের ঘরের দরজা ভেজানো, ভেতরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। রাস্তা থেকে হুক করে কানেকশান নেওয়া। আনোয়ার তাব ঘরে ইলেকট্রিক নেয়নি. নিলে মাসে মাসে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশি ভাড়া গুণতে হত। সে ঘরে হ্যারিকেনই জ্বালায়।

অন্যদিন তার কাশি শুনেই রুকসানা উঠোনে এসে দাঁড়ায়, দুটো কথা বলে। আজ কেউ বেরলো না। আনোয়ার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দরজার দিকে দু'পা এগোলো। শুনল ভেতর থেকে চাপা গলায় কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। একবার মনে হল চাপা ফোঁপানিও শুনতে পেল সে। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে আনোয়ার ডাকল—'সোরাবভাই!'

সোরাবের এসময় বাড়ি থাকার কথা নয় আনোয়ার জানে। ভেতরের কথাবার্তা থেমে গেল। দরজা খুলে বাইরে এল রুকসানার মা আমিনাবিবি। অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না, আনোয়ার একটু ইতস্তত করে বলল—'এই..ক'টা রোল আজ বেঁচেছিল, তা ভাবলাম ঘরে নিয়ে যাই...'

আমিনা বিনা বাক্যব্যয়ে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল, নিয়ে ঘরে ঢুকে ফের দরজা ভেজিয়ে দিল। আনোয়ার একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে এদের ঘরে কিছু একটা হয়েছে। আজ আর রুকসানার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সে রাত্রে আনোয়ারের রেলগাড়ি আর জঙ্গলে ঢুকল না। তার বদলে কেমন একটা খোলা জায়গা দিয়ে আস্তে আস্তে হেলতে দুলতে চলল। জায়গাটার চারদিকে শুধু নীল আকাশ, আকাশে শাদা শাদা মেঘ। রুকসানার ইস্কুলের পোশাকের মত। নীলশাদা আকাশটা হঠাৎ রেলগাড়ির জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল আর গাড়িটাকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে উড়তে উড়তে যেন কোথায় চলে গেল। সেই সেখানে, যেখানে সে নিজের হাতে একটা রোল নিয়ে রুকসানাকে বলছে—'খাও না, খাও!'

রুকসানার পরনে হঠাৎ সবুজ সালোয়ার কামিজ, চুমকি বসানো ওড়না, সে আনোয়ারের হাতে ধরা রোলে হাসতে হাসতে কামড় দিয়ে বলল—'এবার তুমি খাও?'

সকালে রুকসানা তার দরজায় এসে দাঁড়ালো। স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়নি, মাথার চুলও এলোমেলো, বাসি। আনোয়ারকে চাপা গলায় বলল

—'কাল দিদি এসেছিল, জানেন তো?'

—'কোন্ দিদি?'

—'সালমা, সালমা। ক'দিন আগে বিয়ে হল যার। কাল এসে শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইছিল না—'

—'কেন?'

—'তারা দিদিকে মারে। দিদি দেখাল। পিঠে এই বড় বড় ছ্যাঁকার দাগ। দিদি খুব কাঁদছিল। তা মা আর আব্বা জোর করে পাঠিয়ে দিল আবার ..'

—'কালকেই? ক'টার সময়?'

—'এগারোটা ট্যাগারোটা হবে। আব্বা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছে।'

রুকসানা আর দাঁড়ালো না। আমিনাবিবি কলতলা থেকে বাসনের পাঁজা নিয়ে ফিরছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মায়ের হাত থেকে ওগুলো খালাস করে নিল সে।

আনোয়ার ভাবল, তাহলে কাল ঘরের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল এই নিয়ে, সালমাই কাঁদছিল। সে তো দশটা নাগাদ শুয়ে পড়েছে। তারপর সোরাব বাড়ি ফিরে সালমাকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরৎ দিয়ে এসেছে। আনোয়ারের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেতরের ব্যাপার কিছুই না জেনেও তার মনে হল, মেয়েটাকে তারা মারধোর করছে যখন, মা বাপ ক'দিন নিজেদের কাছে রাখলে পারত। বিশেষ করে একসপ্তাহ আগে সালমা যখন এসেছিল, বোঝা যাচ্ছিল তার বাচ্চা হবে। আহা, পোয়াতি বউকে কি অমন করে কেউ মারে?

পরদিন আনোয়ার যথারীতি দোকানে গেছিল। রাতে দোকান থেকে ফিরে বস্তির মুখে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তার কানে এল বুকফাটা কান্না। আমিনা বিবির গলা না? বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল আনোয়ারের, সে যেন আঁচ পেয়েছে কী দুর্ঘটনা ঘটতে

পারে। বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র রুকসানা পাগলের মত ছুটে এল—'দিদি গলায় দড়ি দিয়েছে রোলঅলা!'

উঠোনে বস্তির লোক ভেঙে পড়েছে। সালমার শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর নিয়ে যারা এসেছিল, তারা কোন ফাঁকে সরে পড়েছে কেউ খেয়াল করেনি। আমিনা গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে, অন্য মেয়ে বউরা তাকে সামলাতে পারছে না। সোরাব উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছিল। আনোয়ার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে একবার চোখ তুলে তাকালো, কিছু বলল না। শরীরটা তার কাঁপতে শুরু করল কান্নার দমকে।

আনোয়ার পিছিয়ে এসেছিল। বস্তিতেই থাকে মজিদ। আনোয়ারের সমবয়সী। সে কানে কানে বলল—'গলায় দড়ি নয়, সালমাকে খুন করে দিয়েছে।'

আনোয়ার আঁৎকে উঠল, —'মানে!'

—'খবর নিয়ে এসছিল ও পাড়ার রিন্টু আমার দোস্ত। আমাকে বলেছে, মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে রান্নাঘরে। সালমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, মারধোর করত, বরটার অন্য জেনানা ছিল তো। রিন্টুরা জানে। কাউকে বলো না।' মজিদ চোখ টিপল।

আনোয়ার ঘামছিল। কোনওক্রমে ঘরের তালা খুলে ধপ করে মেঝেয় বসে পড়ল সে। কী কাণ্ড! মজিদ তাকে বলতে বারণ করেছে। সে আর কাকে বলবে? কিন্তু মজিদই যে দায়িত্ব নিয়ে ও কাজটি করবে, সে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

হলও তাই। আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। সালমা নিজে মরেনি, তাকে খুন করা হয়েছে। আমিনাবিবির কান্না কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ হয়ে গেল, পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরে পাড়া কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। সোরাব হাতের বিড়ি ফেলে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, দাঁতে দাঁত পিষে বলল—'আল্লার কিরে, যারা আমার সালমাকে মেরেছে তাদের আমি—'

ভয়ঙ্কর একটা শপথই করতে যাচ্ছিল সে। তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল আঞ্জুমান শেখ, স্থানীয় মসজিদের মোয়াজ্জেম। চাপা ধমকের গলায় বলল—'কর কী কর কী মিঞা, শোকে যে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল দেখছি! কে কী বলে গেল তাই বিশ্বেস করে নিলে? বলি ঘরে তোমার আরেকটা মেয়ে নেই?'

কথাগুলোয় যেন জাদু ছিল। মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যপট বদলে গেল। চোখের পলকে ঠাণ্ডা মেরে গেল সোরাব। শূন্য দৃষ্টিতে একটুক্ষণ আঞ্জুমানের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বসে পড়ল সে। তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নিতান্ত অসহায় মেয়েমানুষের মত। অন্যদিকে আমিনাবিবি, যে এতক্ষণ উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে শানে মাথা ঠুকে ঠুকে বিলাপ করছিল, সে চট্ করে কান্না থামিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। তার পেছনে পেছনে গেল রুকসানা। ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল সে। আমিনার সঙ্গে যারা বিলাপ করছিল, বস্তির বউঝিরা, তারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজিত একটা গুঞ্জন পাকিয়ে তুলল। বস্তির পুরুষেরা স্পষ্টতঃ দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদলের রক্ত গরম, তারা বলতে চাইছিল, সালমাকে খুন করা হয়ে থাকলে তারা ছেড়ে দেবে কেন? আরেকদল ব্যাপারটা চাপা

দিতে চেষ্টা করছিল। আঞ্জুমান শেখ কড়া গলায় বলল—'মেয়ের মা বাবা না চাইলে তুমি আমি কিছু করতে পারি না। তবে ও-পাড়ায় একবার যাওয়াটা আমাদের ফর্জ্। কারা যেতে চাও চল ; —সোরাবমিঞা শক্ত হও। তোমাকে তো যেতেই হবে।'

আঞ্জুমানের কথা মেনে নিল সবাই, দু'দলই। প্রায় সবাই-ই সালমার শ্বশুরবাড়ি চলল, ব্যাপার দেখতে। সঙ্গে গেল সোরাব। এমনকি আমিনা আর রুকসানাও। আমিনার মুখ চোখ ফুলেছে খুব, কিন্তু তার চোখে এখন একবিন্দুও জল নেই।

আনোয়ার যায়নি। সে মনে মনে তাদের সমর্থন করেছিল, যারা প্রতিশোধের কথা বলছিল। কিন্তু আঞ্জুমানের কথার মর্মও যে সে বোঝেনি তাও নয়। খুনের অভিযোগ তোলা মানেই থানা-পুলিশ মামলামোকদ্দমা। ঘরের মানইজ্জৎ পয়সাকড়ি নিয়ে টানাটানি। ওসব ঝঞ্ঝাট করতে গেলে রুকসানার বিয়ে হবে কী করে?—রুকসানার বিয়ে! আনোয়ারের মাথা হঠাৎ ঝাঁঝাঁ করে উঠল। কথাটা এতক্ষণ সেভাবে ঠিক খেয়াল করেনি সে, কিন্তু রুকসানার বিয়ের কথা মনে আসতেই তার মনকে এমন ছটফট করে উঠতে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। নিজের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাটা যেন সে এতদিন জানতে পারেনি।

রেলগাড়ি সেদিন ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেন্ট করে বসল। নিজের দোষেই। রুকসানা সবুজ সালোয়ার, চুমকিদার ওড়না পরে ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে, মুখে তার চুলবুলে হাসি, একবার তার দোর ধরে দাঁড়াল, হাত নেড়ে কিসের ইশারা করছে... এইসব ছবির পর ছবি চলছিল লাইন ধরে। গাড়ি বেলাইন হল যখন সে দেখল, সে রুকসানাকে আদর করে বলছে—'আমাকে শাদি করবে?' রুকসানা এক ধাক্কা মারল তাকে, রেলগাড়ি ছিটকে পড়ল লাইনের পাশে। আনোয়ারের মাঝরাতে ঘুম ভাঙল, এমনটা তার ভাঙে না সচরাচর। চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে, দু ঢোঁক পানি খেয়ে সে ঘরের বাইরে উঁকি দিল। সোরাবরা ফিরেছে কিনা বোঝা যায় না। আনোয়ার আবার শুয়ে পড়ল। তার রেলগাড়ি ফের চলার জন্যে তৈরি। আনোয়ার জোর করে রেলগাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল কেশরগঞ্জের দিকে। অনেকদিন পর। মাকে একখানা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল সে, উত্তর আসেনি।

পরের দিন সকালে উঠতে একটু দেরিই হয়ে গেল। রুকসানা এল না। আনোয়ার আশা করেছিল, কিন্তু একটু পরেই নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। কাল রাত্রে মাটি টাটি দিয়ে কখন সব ঘরে ফিরেছে কে জানে, আরও বেলা অবধিই হয়ত ঘুমোবে সবাই। সোরাব আমিনারও দেখা নেই, তাদের ঘরও ভেতর থেকে বন্ধ। সমস্ত বস্তিটারই কেমন ঝিমিয়ে যাওয়া ভাব। আনোয়ার নিজের মত দোকানে চলে গেল।

তারপর একসপ্তাহ কাটল, দু'সপ্তাহও কাটল। আনোয়ার দোকান করে, বাড়ি আসে, খাওয়াদাওয়া করে, ঘুমোয়। রুকসানার সঙ্গে তার দেখা হয় না। তার প্রাণটা আনচান করে। আশ্চর্য, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে নাকি মেয়েটা? আনোয়ারের বিশ্বাস হয় না। রুকসানা বলেছিল অন্তত মাধ্যমিকটা সে দেবেই। দিদির শোক কতদিন থাকে?

সোরাব গ্যারেজে যাচ্ছে, আমিনাও রান্নাবান্না করছে, বাসন মাজছে। মাঝখান থেকে রুকসানা পড়া বন্ধ করল কেন?

কথাটা সোরাবকে বলি বলি করেও বলা হচ্ছে না আনোয়ারের। শেষে একদিন রাতে সে জিগ্যেস করেই ফেলল,

—'সোরাবভাই আপনার মেয়েকে যেন ক'দিন দেখি না, তার কি অসুখবিসুখ করল নাকি?'

সোরাব তীক্ষ্ণ চোখে আনোয়ারকে একবার মাপল। তারপর বলল,

—'না, অসুখ করবে কেন, সে বাড়ি থেকে বেরোয় না। তার শাদির ঠিক হয়ে গেছে।'

আনোয়ারের বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগে।

—'রুকসানার শাদি? কবে? কোথায় ঠিক হল?'

—'সামনের রোববার। তারা আর দেরি করতে চায় না—।'

আনোয়ার কলের পুতুলের মত বলে

—'কারা!'

—'সালমার জামাই-ই নিকে করবে ওকে। বউ ছাড়া তাদের সংসার চলছে না...'

সোরাব আরও কিছু বলছিল। কেমন যেন কৈফিয়তের সুর বাজছিল তার কথায়। কিন্তু আনোয়ার কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। সে জেগে ছিল, কিন্তু তার মাথার মধ্যে রেলগাড়িটা চলতে শুরু করে দিয়েছিল। এত দ্রুত ছুটছিল রেলগাড়িটা, যে সে আলাদা করে তার বগিগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল না। তীব্র ঝক্ ঝক্ শব্দে আর তীক্ষ্ণ হুইস্‌লে সোরাবের সমস্ত কথা ডুবে যাচ্ছিল।

আনোয়ার ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। তার ঘুম আসেনি। শরীরেও না, মনেও না। আশ্চর্যের কথা, পালানোর জন্যে সারারাত সে আকুল হয়ে রেলগাড়িটাকেই খুঁজেছিল, প্রাণপণে খুঁজেছিল। পায়নি। তার রেলগাড়ি তখন দুমড়ে মুচড়ে একটা খাদে পড়ে আছে।

প্রজন্ম

অপরেশ দোতলার বারান্দায় বসে বৈকালিক ছানা খাচ্ছিলেন। চার বছর আগে তাঁর হার্টের দোষ ধরা পড়ে, তারপর থেকে এই ব্যবস্থা। ছানায় হার্টের অসুখ সারে না যদিও, কিন্তু শরীরটা তো সারে। এই যুক্তিতে মীরা যখন সকালে এককাপ কমপ্লান আর বিকেলে একবাটি ছানার রুটিন করে দিলেন, বহু বছর পর অপরেশের বুকের মধ্যে টলটল করে উঠেছিল। তিরিশ বছর বিয়ে হয়েছে তাঁদের। তিনি রিটায়ার করেছেন পাঁচবছর আগে। ঐ সময় থেকেই নানা কারণে নানা অজুহাতে নিজেকে অবাঞ্ছিত অবহেলিত মনে হওয়ার শুরু। অপরেশের বিশ্বাস, হার্ট অ্যাটাকটাই পরিবারেব মধ্যে তাঁর হৃত মূল্য অনেকখানি পুনরুদ্ধার করেছে।

কমপ্লান আর ছানা ক্রমশ অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু এখনও, খেতে খেতে প্রায়ই অপরেশের জিভ থেকে সারা শরীরে কেমন একটা আত্মপ্রসাদ, তৃপ্তি আর নিরাপত্তার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, শিরশিরে চোরা স্রোতের মত। যখন এমন হয়, অপরেশ গোপনে সেটাকে ভারি উপভোগ করতে থাকেন। আজও করছিলেন। হঠাৎ বেল বাজল।

অপরেশ গলা বাড়িয়ে দেখলেন, নীচে সদর দরজার সামনে রাস্তায় দুটি যুবক দাঁড়িয়ে। একজন চেনা, অন্যজন মুখচেনা। দুজনেই পার্টি করে। পার্টি মানে, অপরেশের পছন্দের পার্টি। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মত নিত্যনতুন রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠছে, দেখতে দেখতে একটা দল ভেঙে পাঁচখানা হচ্ছে, কোনও দলেই ছেলে ছোকরার অভাব নেই। অপরেশ তাদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। পার্টি কী বস্তু, পার্টি করা মানে কী, অপরেশ যৌবনে যা একটু আধটু করেছেন, তা শুধু এই পার্টির লোকেরাই জানে।

ছেলেদুটি কেন এসেছে, অপরেশ বুঝতে পারলেন। ওদের হাতে ভোটের কাগজপত্র। ভোট এসে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় দেয়ালযুদ্ধ আর সন্ধে হতে না হতেই মাইকে গলাবাজির কামাই নেই। এ সময়ে মনে মনে অপরেশ দারুণ উত্তেজিত বোধ করেন। বিশেষ করে, পুরনো পার্টির সঙ্গে কী যেন একটা অনেককালের ভুলে যাওয়া সম্পর্কের সুতোয় টান পড়ে বুকটা টনটন করে ওঠে। কেন যে এমন হয় অপরেশ ঠিক বুঝতে পারেন না, কিন্তু পাড়ায় দুএকজন, যাঁদের সমমনস্ক বলে বিশ্বাস হয়, তাঁদের সঙ্গে এই ভোট-পার্টি-রাজনীতি-দেশটেশ নিয়ে দু'দণ্ড আলোচনা করতে ইচ্ছে করে। ব্যস্তসমস্ত যুবকদের মনেমনে কাছে ডেকে বলেন—'বুঝলে হে, সেই ছেষট্টি সাতষট্টিতে.... আমরাও....'

চেনা ছেলেটির নাম সুজিত। অপরেশ বারান্দা থেকে প্রসন্নকণ্ঠে সাড়া

দিলেন—'সুজিত, দাঁড়াও আসছি।'

পাড়ার সকলের সঙ্গেই নির্বিরোধী অপরেশের ভালো সম্পর্ক। আর পার্টির ছেলেরা তো তাঁকে বরাবর একটা আলাদা সম্মানই দিয়ে এসেছে। পুরনো সমর্থক, বহুদিনের সুনিশ্চিত একটা ভোট। প্রতিবার আন্তরিকভাবে বলে যায় —'সকাল সকাল চলে যাবেন, কাকাবাবু। আপনাকে নতুন করে কিছু বলার নেই...শিওর ভোটগুলো ঠিকঠাক সময়মত পড়ে গেলেই আমাদের চিন্তা নেই, ফ্লোটিং ভোট নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না।'

অপরেশ হাসিমুখে আশ্বাস দ্যান। সত্যিই তো, এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো তাঁকে আর নতুন করে কী বলবে। তিনি রোজ সাড়ে পাঁচটায় মর্নিং ওয়াকে বেরোন, রিটায়ারমেন্টের পর থেকেই এই নিয়ম। ভোটের দিন মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরার পথেই সোজা চলে যান বুথে। বেশির ভাগ সময় তিনিই প্রথম ভোটার, নাহলে বড়জোর তিনচারজনের পর। ফাঁকায় ফাঁকায় সেরে নিশ্চিন্তমনে সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি। তাঁর এহেন উৎসাহের আধিক্য নিয়ে বাড়িতে মীরা আর ছেলেমেয়েরা কম হাসাহাসি করে না। চুমকি বলে, —'বাবার ভোটটাই হল গিয়ে মোক্ষম ডিসিসিভ। সরকার থাকবে না পড়বে তার কী-ফ্যাক্টর।' চুমকির বয়স চব্বিশ, ছেলে বাবলার আঠাশ। দুজনেই স্বীকৃত ভোটার, তবে কেউই ভোট দ্যায় না। মীরা আগে দিতেন। এখন ছেলেমেয়েদের দলে ভিড়েছেন। শুধু তাই নয়, অপরেশ লক্ষ্য করেছেন, ভোটের কথা উঠলেই মীরা সব পার্টিকেই এক ধার থেকে গালাগালি করেন। তার বেশিটাই অপরেশকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

অপরেশ হাসিমুখে দরজা খুলে দেখলেন, ছেলেদুটির মুখচোখ গম্ভীর গম্ভীর। খটকা লাগল, তাও অপরেশ হালকা গলাতেই বললেন —'এই যে, বল সব কী খবর, কেমন বুঝছ টুঝছ...'

ওরা কোনও উত্তর দ্যায় না। সুজিত অপরেশের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করে। একটু পরে অস্বস্তিভরা গলায় প্রশ্ন করে—'কাকাবাবু, কাকীমা কিছু বলেননি আপনাকে?'

—'কই না! কী ব্যাপার!'

—'সোমবার আমরা এসেছিলাম। আপনি বোধহয় বাথরুমে ছিলেন, কাকীমার সঙ্গে কথা হল....ভোটার লিস্টের ব্যাপারে....'

—'ওহো, তাই বল, হ্যাঁ হ্যাঁ। মীরা বলছিল বটে—'

অপরেশের মনে পড়েছে। সপ্তাহখানেক আগে মীরা বলছিলেন সুজিত বলে গেছে এবারের ভোটার লিস্টে নাকি তাঁর আর মীরার নাম নেই। অপরেশ কথাটাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দ্যাননি। এরকম হয় তিনি জানেন, কিন্তু তাঁরা এতদিন ধরে এখানে আছেন, এই এলাকায় এসব কখনও হতে দ্যাখেননি। নিজের ক্ষেত্রেও না, অন্যের ক্ষেত্রেও না। বিশেষ করে, রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে এলাকার পুরনো বাসিন্দা হিসেবে সবাই তাঁকে জানে চেনে। তাঁর মনে হয়, সম্মানও করে। কাজেই, খবরটা পাওয়ার পর থেকে আজ এই মুহূর্ত অবধি তাঁর একেবারেই বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন, সুজিতের হাবভাবে, তার কথার ধরণে

অপরেশ একটু সন্ত্রস্ত বোধ করলেন, বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল আশঙ্কামিশ্রিত সন্দেহ। তবু যেন সেগুলোকে অবচেতনেই জোর করে চেপে রেখে অপরেশ বলে উঠলেন—'তা সে ওরকম ভুল তো হতেই পারে, শুধরে নিতেই বা কতক্ষণ, তোমরা রয়েছ—'

—'না, কাকাবাবু!'

—'অ্যাঁ!'

—'এই ভোটের আগে আর শোধরানো যাবে না। আমাদের আর কিছু করার নেই। বারবার মিলিয়ে দেখেছি। কোথাও নেই। আপনারও না, কাকীমারও না, ...ওইদিকে সান্যালদের বাড়ি থেকেও একটা ভোট এরকম উধাও...'

ব্যাপারটা বুঝতে অপরেশের বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগে, বোঝার পরেও বিশ্বাস হতে চায় না। বিস্ময়ে কথা জোগায় না তাঁর মুখে। কোনওক্রমে বলেন—'সে কী! এ কী করে সম্ভব? তিরিশ বছর ধরে এ পাড়ায় আছি, কোনওদিন আমি একটা ভোটও মিস্ করিনি....'

—'জানি, জানি কাকাবাবু,' সুজিত শুকনো গলায় সান্ত্বনা দ্যায়। অস্থিরভাবে মাথা নাড়ে, বলে—'আমাদের কি কম লস্, বলুন তো...এত খারাপ লাগছে ...কী করে যে এমনটা হল....'

সুজিতের সঙ্গী এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার সে মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে চাপা গলায় বলে ওঠে—'বেছে বেছে আমাদের জেনুইন ভোটগুলো উড়িয়ে দিয়েছে ওরা...'

অপরেশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। সুজিতরা চলে যায়। যাওয়ার আগে অপরেশের হাতে গুঁজে দিয়ে যায় দুটো পাতলা কাগজ—ভোটার্স স্লিপ। মৈনাক মিত্র ২৭ আর চৈতালী মিত্র ২৩। তাঁর ছেলেমেয়েদের ভোটাধিকার অক্ষুণ্ণ আছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রের তিরিশ বছরের ভোটার তালিকা থেকে অদ্ভুতভাবে মুছে গেছে দুটি নাম, অপরেশ কুমার মিত্র ৬৩ এবং মীরা মিত্র ৫৮। এটা কি একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল? অপরেশ ভাবতে থাকেন। মনের মধ্যে সায় পান না। এমন ভুল তো আগে কখনও হয়নি!....এবারের ভোটটা নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ....। অপরেশের মনে হতে থাকে, এর পিছনে যেন কী একটা বিরাট তাৎপর্য রয়েছে, —সেটা কী, তা ঠিক ধরতে পারছেন না। কিন্তু মনে হচ্ছে, কেবলই মনে হচ্ছে যে, এই অভাবনীয় ঘটনা যেন আসলে আরও অনেককিছুর সংকেত......

অপরেশ কিন্তু এতকিছু ঠিক ভাবছিলেন না। তাঁর মাথার মধ্যে একটা ধাক্কা লেগে প্রবল আলোড়ন চলছিল। অজস্র চিন্তা ও অনুভূতির স্বয়ংক্রিয় আসাযাওয়া, অপরেশের সচেতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ঐ অবস্থাতে কোনওক্রমে তিনি দরজাটা বন্ধ করলেন। করতে করতে তাঁর আবারও মনে হল, এটা কি একরকম অস্তিত্বহীনতা? অস্তিত্বহীনতা মানে তো মৃত্যু। মৃত্যু হলে ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়। নাকি উল্টোটা! তাঁর তেষট্টি বছর বয়স হল, হার্ট অ্যাটাকের পর থেকে শরীর খুব একটা ভালো যায় না। অল্পতেই মাথা

ঘোরে....এখন যেমন ঘুরছে। বুকে কেমন কষ্ট হচ্ছে একটা, চোখে ঝাপসা লাগছে...শরীরে কী যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে তাঁর, ...এটাই কি মৃত্যুযন্ত্রণা?

অপরেশ প্রথমে সিঁড়িতে বসে পড়লেন। তারপর বসা অবস্থাতেই গড়িয়ে দু'ধাপ নীচে পড়ে গেলেন। মীরা বিকেলে ফুলগাছের পরিচর্যা নিয়ে তিনতলার ছাদে বিষম ব্যস্ত ছিলেন, তিনি কিছুই জানতে পারেননি। মিনিট পনের পরে, সদর দরজার চাবি খুলে ভেতরে ঢুকেছিল বাবলা। সে বেসরকারি কোম্পানির সেল্সের চাকুরে, বাড়ি ফেরার সময়ের ঠিক থাকে না, অনেক সময় বেশি রাত হয়ে যায় বলে নিজের জন্যে আলাদা চাবি করিয়ে নিয়েছে। দরজা খুলেই অপরেশকে ঐরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার মনে হয়েছিল সব শেষই হয়ে গেছে বুঝি। প্রাথমিক প্রচণ্ড ধাক্কাটা সামলে নিয়ে পরে দেখল—প্রাণ আছে, সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে ঘামে। তখন সে ছুটে গিয়ে পাশের বাড়ির রঞ্জনকে ডেকে আনে, দুজনে মিলে অপরেশকে দোতলায় তুলে নিয়ে আসে। ততক্ষণে মীরা ছাদ থেকে নেমে এসেছেন বাবলার চেঁচামেচি শুনে। পাড়া প্রতিবেশীরাও এসেছেন অনেকে। ডাক্তার নিয়ে আসা হল। বিছানায় শুইয়ে দেবার একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল অপরেশের। ডাক্তার দেখে শুনে বলে গেলেন—'ভেসোভেগাল অ্যাটাক। হসপিটালে নেওয়ার দরকার নেই। বাড়িতেই থাকুন, কিন্তু কমপ্লিট বেডরেস্ট। তবে কাল পরশু একবার ইসিজিটা করিয়ে রাখলে ভালো হয়।'

বলতে নেই, ফাঁড়াটা অল্পের ওপর দিয়েই গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর খানিকক্ষণ অপরেশ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, তাঁর কী হয়েছে, ঘরে এত লোকজন কেন, তিনি কোথায় শুয়ে আছেন! তারপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। মনের ওপর দিয়ে পরপর ছবিগুলো ভেসে গেল, —সুজিতরা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করা অবধি। দরজা বন্ধ করতে করতে তাঁর শরীর খারাপ লাগছিল তাও মনে আছে। তারপর সব অন্ধকার। তিনি তবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন! অপরেশ মাথাটা একটু তুলতে গিয়ে দেখলেন ভীষণ ভারী। শরীরটাও খুব দুর্বল লাগছে।

ঘরে অনেক লোক। একবার মনে হল চুমকির গলা পেলেন, সবাই জল্পনা করছে কেন তিনি নীচে নেমেছিলেন, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কী করে, এই নিয়ে। অপরেশ হঠাৎ মনে মনে বড় ভয় পেয়ে গেলেন, সত্যি ঘটনাটা জানার পর এদের প্রতিক্রিয়াটা ঠিক কেমন হবে! সবাই অবাক হয়ে যাবে সন্দেহ নেই, কেউ কেউ রেগেও যাবে বোধ হয়। দু' একজন খুশি হবে। দু'একজন? নাকি আরও বেশি? মীরা বলবে—'কী আশ্চর্য, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি' ইত্যাদি ইত্যাদি। অপরেশ নিস্তেজ হয়ে শুয়ে রইলেন। পাড়াপড়শিরা একে একে চলে যাচ্ছে, অপরেশ টের পাচ্ছিলেন। তাঁর স্বস্তি লাগল একটু. যাক্ এরা কেউ অন্তত তাঁকে প্রশ্নটা করেনি। কিন্তু একসময় না একসময় ঐ প্রশ্নের উত্তর তো তাঁকে দিতেই হবে।

দিতে হল। ঘণ্টাখানেক বাদে আর একটু সুস্থ বোধ করলে অপরেশ বেশ

পরিপূর্ণভাবে চোখ খুলতে পারলেন। ঘরে সবাই ছিল—মীরা বাবলা চুমকি। মীরা ঝুঁকে পড়ে বললেন—'জল খাবে?' অপরেশ ঘাড় নাড়লেন।

বাবলা ছট্‌ফট করছিল। অপরেশের জল খাওয়া শেষ হতেই সে জিগ্যেস করল—'কিন্তু তুমি নীচে নেমেছিলে কেন বলতো!'

অপরেশ চুপ। মীরা উদ্বিগ্নস্বরে বললেন—'আমি ছাত থেকে একবার শুনলাম যেন বেল বাজল। ভাবলাম বুঝি কাজের মেয়েটা এসেছে, তোর বাবা চাবি ছুঁড়ে দেবে। তাই তো দেয়া হয় আজকাল। আমি তো ওদিকে ছাতে গাছ নিয়ে—'

—'উফ্‌ফ্‌, থামো তো!'

মাকে থামিয়ে দিল চুমকি। সে কলেজ থেকে ফিরেই দেখেছে বাড়িতে হলুস্থূলু, বাবার শরীর খারাপ। তার প্রকৃতিটা এমনিতে একটু অদ্ভুত। নিজেকে নিয়েই থাকে, পৃথিবীর অন্য যে কোনও ব্যাপারেই গা ছাড়া ভাব। আজও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বাবার অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাটা তাকে তেমন ছোঁয়নি, সে এতক্ষণ অলসভাবে একটা ইংরিজি কাগজের ক্রসওয়ার্ডে নিবিষ্ট ছিল। এবার কাগজ থেকে মুখ তুলে কড়া গলায় মাকে চুপ করিয়ে দিল, বলল—'বাড়তি কথা বোলো না, জানতে দাও বাবা নীচে নেমেছিল কেন!'

অপরেশ মেয়েকে মনে মনে ভয় করেন। তার কারণ, চুমকিকে তিনি বোঝেন না। মীরার সঙ্গে তাঁর সাংঘাতিক মনের মিল না থাকলেও, তিরিশ বছরে মীরাকে তিনি একরকম পড়ে নিয়েছেন। এমন কী বাবলা সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার। আজকালকার আর পাঁচটা ক্যারিয়ারিস্ট যুবকের সঙ্গে তার কোনও ফারাক নেই। চলনসই কর্তব্যবোধ ছাড়া মা-বাবার সঙ্গে অন্য কোনও বন্ধনে বিশ্বাসী কিংবা আগ্রহী নয়। অপরেশ সে প্রত্যাশা রাখেনও না। কিন্তু চুমকি এসমস্ত হিসেবের মধ্যে পড়ে না। তার স্বাভাবিক উদাসীন স্বভাব কোনও ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে পড়লে ভয়ঙ্কর চেহারা নেয়। এবং সেটা হয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভাল র‍্যাঙ্ক করেছিল, ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোতেই! মা বাবা দাদা কারও কথা কানে না তুলে যাদবপুরে গিয়ে ইতিহাসে ভর্তি হয়ে এল। ছেলেমেয়েদের অপরেশ কোনদিনই শাসন করতে পারেননি। কিন্তু মীরা চাপ দিয়েছিলেন। আর বাবলা, ঘাড়বেঁকা বোনকে শায়েস্তা করতে তার গালে একটি চড় বসিয়ে দিয়েছিল। চুমকি কাঁদেনি। ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল— 'আমাকে জোর করলে ফল ভালো হবে না। কী করব জানো? তোমাদের তিনজনকে এক একটা চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধব যাতে নড়তে না পারো, মুখ বেঁধে দেব যাতে চিৎকার করতে না পারো, তারপর—'

মীরার আর সহ্য হয়নি, চেঁচিয়ে উঠেছিলেন— 'তাই কর, তাই কর রাক্ষুসি, বাড়ি শুদ্ধু সব্বাইকে খুন করলেই তো তোর শান্তি, আমরাই তো তোর শত্রু—'

—'খুন কর' কেন, তার চাইতে বেশি শাস্তি দেব। তোমাদের চোখের সামনে ফ্যান থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব, তোমরা বসে বসে দেখবে।'

মীরার মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ছিটকে এসেছিল, বাবলা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল—'সাইকিক পেশেন্ট, তোর চিকিৎসার দরকার।'

চুমকি আর কোনও কথা না বলে নিজের টেবিলে বসে বইপত্র গুছোতে শুরু করেছিল। অপরেশের হাত পা ঠাণ্ডা লাগছিল, তিনি ভাবছিলেন, এত নিষ্ঠুরতা শিখল কোথায় মেয়েটা। তাঁর কিংবা মীরার মধ্যে তো এ জিনিস নেই। ....তারপর থেকে মেয়ের সঙ্গে মামুলি বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে গেলেই অপরেশের হৃৎকম্প হয়।

অপরেশ চুমকির দিকে তাকালেন না। মনে মনে নিজেই নিজেকে বললেন, এত ভয় পাওয়ার কী আছে। শরীরটা দুর্বল বলেই বোধহয় মনে জোর পাওয়া যাচ্ছে না। কারণটা বললে এরা বড়জোর একপ্রস্থ হাসাহাসি করবে, রাগারাগি করবে—এই তো! তাঁর মনের সত্যিকারের অবস্থা কেউ বুঝতে পারবে, এমন আশা তিনি করেন নাকি!

অপরেশ বললেন, সংক্ষেপে নয়, বেশ একটু বড় করে গুছিয়েই বললেন। বলতে বলতে দেখলেন, মনে জোর ফিরে আসছে, যদিও শরীরে কষ্ট হচ্ছে। হাঁপিয়ে গেলেন। কিন্তু কথা শেষ করে খুব হাল্কা লাগল তাঁর, মনে একটা আরাম বোধ করলেন।

ওরা চোখ বড় বড় করে শুনল। তারপর—আশ্চর্য, অপরেশকে যারপরনাই হতভম্ব করে দিয়ে মীরা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন—'আর দ্যাখো, এবারই ভেবেছিলাম ভোটটা দেব। দেয়া দরকার। দেশের যা অবস্থা, কী দিনকাল যে পড়তে চলেছে বেশ বুঝতে পারছি,...এসময়ে একটা ভোটও যদি ঠিক দলকে দেয়া যায়..., অথচ এবারই নাম কাটা গেল।'

অপরেশ হাঁ করে মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন বুঝতে চান মীরা কৌতুক করছেন কিনা। মীরার মুখে কিন্তু পরিষ্কার আপশোসই দেখতে পেলেন তিনি। এত দুঃখের মধ্যেও মীরার কথাগুলো অপ্রত্যাশিত সুখ দ্যায় তাঁকে। উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসতে যান, না পেরে আবার শুয়ে পড়েন। আকুল গলায় বলেন—'বোঝো, বোঝো তাহলে, বোঝো একবার চালাকিটা। ওরা জানে এবারের ভোটটা কী ভাইটাল, আর এও খুব ভালো করেই জানে যে তুমি আমি কাকে ভোট দেব, ঐ জন্যেই আমাদের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে...'

—'আঃ বাবা!' বাবলা বিরক্ত হয়ে ওঠে রাগী গলায় বলে—'ভোট ভোট করে তোমরা পাগল হলে দেখছি। নাম কাটা গেছে আপদ গেছে। তোমার একটা ভোটে কী আসত যেত?'

অপরেশ জোরে জোরে মাথা নাড়েন,—'না না না বাবলা, একা আমার ভোট নয়, তোর মায়েরটা, আরও কয়েকজনের। এভাবে একটা দুটো করে, ওরা অনেক ভোটই নষ্ট করে দিয়েছে। বুঝতে পারছিস না এর পরিণতি কী সাংঘাতিক হতে পারে?'

—'খুব বুঝছি, তোমার পার্টি হারবে, তাই তো! হারে তো হারুক না, তাতে তোমার আমার কী?'

—'তোর আমার কিছু না?' অপরেশের স্বরে তাঁর কষ্ট বেজে ওঠে, হাহাকারের

মত শোনায়।

—'না। তুমি ঐসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না। আজ মাথা ঘুরে পড়ে গেছ, কাল এর চাইতে বেশি কিছু হলে কে সামলাবে? আমার চাকরি চাকরি কিছু নেই?' বাবলা প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আর একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্লেষের সঙ্গে বলে যায়—'এদের তো হারারই কথা। একটা পরিবর্তন আসার খুব দরকার। এক জিনিস দেখছি সেই কবে থেকে, একটু মুখ বদলাব না?'

একটানে জামা খুলে বাবলা বাথরুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল। সারাদিন প্রচুর ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল সে, ফিরেই এই কাণ্ড। তার ওপর এইসব অর্থহীন সেন্টিমেন্টগুলোকে গায়ের প্যাচপ্যাচে দুর্গন্ধ ঘামের মত মনে হয় তার। তাড়াতাড়ি শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে বাবলা কল খুলে দিল।

অপরেশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বিছানার একপাশে চুপ করে বসে ছিলেন মীরাও, খানিকক্ষণ পরে যেন অনেকটা নিজের মনেই বললেন,—'বাবলা জন্মেছে তিয়াত্তরে, আর চুমকি সাতাত্তরে। ওরা কী কিছু দেখেছে যে বুঝবে! কারা হারলে যে কাদের কী একথা অভিজ্ঞতা না থাকলে আর কে কাকে বোঝাতে পারে! তুমি আর কথা বাড়িও না।'

চুমকি চুপচাপ পুরো ঘটনাটা দেখছিল। এবার সে হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজটা গোল করে পাকিয়ে নিজের মাথায় দু'বার ঠুকল। মজার সুরে বলল—'বেশ, বেশ, বুঝলাম।' তারপর হেলতে দুলতে পাশের ঘরে গিয়ে টিভি খুলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ডিভানের ওপর।

মীরাও উঠে গেলেন কোনও কাজে। বাইরে যথারীতি ভোটের প্রচার শুরু হয়ে গেছে। কে যেন আগুনের মত বক্তৃতা দিয়ে চলেছে, তবে কী বক্তব্য, কে বলছে, কোন দল, —অপরেশ বুঝতে পারছেন না। চিৎকারটা চলতেই থাকল, কিন্তু অপরেশ ক্রমে আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না। তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে যাচ্ছিলেন।

মীরা ঠিকই বলেছে। সত্যিই তো বাবলা আর চুমকি কী বুঝবে তাঁর ভয়ের কারণ! ওরা বড় হয়েছে একটা শান্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে। বাবলারা আজ পরিবর্তনের কথা বলে, স্থিতাবস্থা ওদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে, তাই। রোজ দুধ খেতে হলে বাচ্চারা ফুটপাতের আলুকাবলির জন্যে মরীয়া হয়ে ওঠে। ওদের তিনি কী দিয়ে নিরস্ত করবেন? অথচ তাঁরা কোন্ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন....সেই অতীত দুঃস্বপ্নের দিনগুলোতে কোনওক্রমে বেঁচে থাকতে থাকতে আশা ছাড়েননি যে তাঁর পার্টি ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বদলে যাবে। সেই সময়কার নৃশংসতা, হিংসা, অরাজকতা কোনও কিছুরই আঁচ লাগেনি বাবলা চুমকিদের গায়ে। ওরা ইচ্ছেমত বড় হতে পেরেছে, ইচ্ছেমত পড়াশুনো, চাকরিবাকরি...। ভাগ্যিস। তিনি আর মীরা অনেক দেখেছেন, অনেক সহ্য করেছেন। ছোটবেলার স্মৃতি দেশভাগ আর দাঙ্গা। তারও চাইতে ভয়াবহ সত্তরের রক্তাক্ত দিনগুলো। সে সময় ভয়ে তাঁরা কাউকে বলতে পারতেন না তাঁরা কোন্ দলের সমর্থক।

বাড়িতেও আলোচনা করতে সাহস হত না। মনে হত দেয়ালেরও কান আছে। সমস্ত বিশ্বাস বড় ভয়ে ভয়ে জমিয়ে রাখতেন মনের কোণে, লুকিয়ে রাখতেন বুকের একেবারে তলে গোপন চোরাকুঠুরিতে। এইভাবে, ঝড়ের মুখে সাবধানে একটা বিশ্বাসকে আগলে রাখতে রাখতে নিজের অজান্তেই ভেতরে ভেতরে তৈরি হয় এক অদ্ভুত বোধ, গভীর সাহস। এই বোধ আর সাহসের কথা নিজেই টের পাওয়া যায় না, মনের তলে তলে শেকড় চারিয়ে তারা ঐ বিশ্বাসটাকেই শক্ত করে ধরে রাখে। একটা বিশ্বাস যখন এইভাবে প্রাণপণে বাঁচতে বাঁচতে মানুষের বুকের মধ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে শেষপর্যন্ত সফল হয়, মানুষটার অস্তিত্বই তখন সেই বিশ্বাসের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে আলাদা করা যায় না। অপরেশেরও তাই হয়েছে। যে রাজনৈতিক সত্যের প্রতি তাঁর এই ব্যাকুল নির্ভরতা, তার বাহ্যরূপ বিশ্লেষণ করলে অপরেশ তার মধ্যে এখন অনেক ফাঁক দেখতে পান, অনেক বিচ্যুতি, অনেক স্খলন। কিন্তু তাঁর মনের ভেতরে সে সত্য অক্ষত, অবিকৃত। বাস্তবিক, তার নব্বই শতাংশই হয়ত এখন আর কোনও রাজনৈতিক দলগত মতাদর্শের সঙ্গে মেলে না, হয়ত তা অপরেশেরই একান্ত ব্যক্তিগত।

মীরাও বরাবর তাঁর সহমর্মীই ছিলেন। আজকাল যে তিনি হঠাৎ বিদ্রোহ হয়ে উঠেছেন, অপরেশ আন্দাজ করেন, এর পেছনে রয়েছে বাবলা ও চুমকির প্রত্যক্ষ প্রভাব। অল্প হলেও, মীরাই তবু কিছুটা ছেলেমেয়েদের ধ্যানধারণা আর জীবনদর্শনের নাগাল পান, অপরেশের সঙ্গে তো তাদের মাইল মাইল দূরত্ব। অপরেশ টের পান, ওরা প্রায়ই মীরাকে নানান আধুনিক মতবাদে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে, যার বেশিটাই নৈরাশ্যবাদ। ওদের তিনি দোষ দ্যান না। সত্যিই তো, দেশটা যে এতদিনেও অ্যামেরিকা কিংবা ইংল্যান্ড হয়ে উঠতে পারল না, এ কী একটা কম ক্ষোভের কথা!

আজ মীরার কথাগুলো শুনে অপরেশ অবশ্য বুঝেছেন মীরাও ভয় পেয়েছেন। ভয় পাওয়ারই কথা। যারা ভয় পাচ্ছে না তারা ঠিক কোন্ পর্যায়ের স্মৃতিহীন, অপরেশ বুঝতে পারেন না। কোথায় যেন তিনি পড়েছিলেন, ভয় জিনিসটা মানুষের মস্তিষ্কের সামনের অংশ, যাকে বলে ফ্রন্টাল লোব, তার প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে ফ্রন্টাল লোব মানুষের বিচার বিবেচনা, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, মূল্যবোধ—এইসবও নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও মানুষের মস্তিষ্কের ঐ অংশটা যদি অকেজো হয়ে যায় বা কেটে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তার আর ভয়ডর থাকবে না। একই সঙ্গে লোপ পাবে বিচার বিবেচনা ইত্যাদির শক্তিও। অপরেশের সন্দেহ হয়, চারপাশের মানুযজনের মধ্যে অনেকেই কি ঐরকম খণ্ডিত মস্তিষ্কের নির্বোধ! ...অন্তত মীরা নন। আশ্চর্য, অনেকবছর পর মীরা এবারই ভোট দেবেন বলে মনস্থির করেছিলেন, অপরেশের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেও নিজে নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন এবারের ভোটটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।...যারা তাঁদের নাম কেটে দিয়েছে, তারাও কোনও ঝুঁকি নেয়নি, অপরেশের সঙ্গে মীরার নামটাও রাখতে সাহস করেনি। অপরেশ বুঝতে পারেন, ওরা বাবলা আর চুমকির নাম কাটেনি, কেননা, তাঁর ক্যারিয়ারিস্ট ছেলে আর খামখেয়ালি মেয়েকে নিয়ে ওদের

কোনও ভয় নেই, এরা হয় ভোটই দেবে না, না হয় নতুন দলকেই ভোট দেবে যারা পরিবর্তনের স্লোগান তুলে আবার সত্তরের দশক ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

মীরা চা নিয়ে এসে দেখলেন অপরেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর ডাকলেন না। থাক, ঘুমোক। বড্ড ভেঙে পড়েছে মানুষটা। চায়ের কাপটা রান্নাঘরে ফেরৎ নিয়ে যেতে গিয়ে পাশের ঘরে উঁকি মেরে বললেন—'চুমকি টিভিটা আস্তে কর। বাবা ঘুমোচ্ছে।'

চুমকি জামাকাপড় বদলায়নি। সেই থেকে এমটিভি দেখে চলেছে। আওয়াজ কমিয়ে দিয়ে ডাকল—'মা শোনো!'

—'কেন, কী বলছিস?

—'বাবা এতটা শক্‌ড্ হল কেন বলতো! নাম কাটা যাওয়াটা এমন কী ব্যাপার?'

চুমকি মা'র দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, কিন্তু তার চোখ আটকে আছে টিভির পর্দায়। সেইভাবেই আবার বলল—'এবারের ভোটটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, জানি, একটা কিছু অন্যরকম হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। কিন্তু..আই মীন...তোমার আর বাবার ভোটটা পড়লেই কি পসিবিলিটি আটকাতে পারতে?' চুমকি হঠাৎ টিভিটা বন্ধ করে দিল। ডিভান থেকে উঠে কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলতে খুলতে মা'র দিকে না তাকিয়েই বলল—'এই সহজ কথাটা মেনে নিতে পারলেই বাবার এতটা শরীর খারাপ হত না।'

মীরা চুমকিকে দেখছিলেন, তাঁর একটু অবাকই লাগছিল। বাড়ির কোনও বিষয় নিয়ে ভাবাটা চুমকির স্বভাববিরুদ্ধ। সে যে কথাগুলো বলল, মীরা তার উত্তর দিতে চাইছেন, ভীষণভাবেই চাইছেন, কিন্তু ঠিক কী বলবেন সেটা গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। প্রচুর কথা তাঁর বুকের মধ্যে গলার ঠিক নীচেটায় এসে ঠেলাঠেলি করছে। চুমকি অলস গতিতে ডাইনিং স্পেসে এসে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা বোতল বার করে জল খেল। মীরা তার পেছন পেছন এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে চুমকির পিঠে হাত দিয়ে বলে ফেললেন —'তুই, তোরা, অনেক জানিস, অনেক বুঝিস। কিন্তু ...নিজের মা বাবাকে কিছুই বুঝিস না...একটুও না!'

মীরার গলায় অনেক কিছু ছিল। বেদনা অভিমান ক্ষোভ আপশোস অভিযোগ ছাড়াও আরও অদ্ভুত কিছু। চুমকি অবাক হয়ে তাকাল, মীরার হাতে এখনও চায়ের কাপডিশ ধরা, ঐভাবেই বললেন—'আমরা এ পাড়ায় যখন প্রথম আসি, পুরো অঞ্চলটা একটা সবজিখেত ছিল। তার পাশে জঙ্গল, পেছনে পুকুর। সেসব জায়গায় বাড়ি উঠল আস্তে আস্তে, একজন দুজন করে লোক আসতে শুরু করল। হিসেব করে বললে আজ তিরিশ বছরের কথা। আমরা এ পাড়ার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা। তারপরে এল মুখার্জিরা, তারপর মহিমবাবুরা...লোকজন বাড়ল। তোর বাবার কাছে সবাই আসত আপদে বিপদে পরামর্শ করতে, রাজনীতি দলটল কোনও ব্যাপার ছিল না। তখন পাকা রাস্তা ছিল না, ইঁট পেতে পেতে আমরাই রাস্তা বানাতাম বর্ষাকালে। রাস্তার ধারে নর্দমা পরিষ্কার করেছে তোর বাবা আর বিল্টুর দাদুতে মিলে, সেসব কত দিনকার কথা। পুরনো মানুষেরা মারাই

গেলেন কতজন, কতজন চলেও গেল, মুখার্জিদের বাড়ি বিক্রি হয়ে ফ্ল্যাট উঠল... সবই তো আমাদের চোখের সামনে...তোরা বড় হলি....ভাবলি বুঝি এ পাড়া এমনই ছিল চিরকাল...।' মীরা বুক ভরে শ্বাস নিলেন। তাঁর গলা ধরে এসেছে, তবু বললেন—'এত বছরের কথা সব মিথ্যে হয়ে গেল, ওরা আমাদের নামই মুছে দিল। আমরা এখন কেউ না। তোর বাবা বড় ঘা খেয়েছে.... বয়েসও তো হয়েছে...শরীরটাও ভালো নয়.. এই বয়েসে...' মীরা হঠাৎ কথা থামিয়ে দ্রুতপায়ে রান্নাঘরে চলে যান। কাপটা নামিয়ে রেখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে থাকেন। চুমকি আড়চোখে মাকে দ্যাখে। সে একটু থতিয়ে গেছিল মীরার দীর্ঘ বক্তব্যের স্রোতে, এবার নিজেকে সামলে নিল। মৃদু আর একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, মনে মনে বলল—বাঃ, সবাই মিলে বেশ একটা হাইলি সেন্টিমেন্টাল এপিসোড বানিয়ে তুলল দেখছি!

দেখতে দেখতে ভোটের দিন এসে গেল। অপরেশ এ ক'দিন বড় ছটফট করেছেন। শরীর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, ইসিজি করানো হয়েছে। সেদিক থেকে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু অপরেশ মনে একমুহূর্ত শান্তি পাননি। সবচেয়ে বেশি কষ্ট গেছে কাল, রাত্রিতে ঘুমও হয়নি। ভোটের দিনটা কীভাবে কাটবে সেই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। তিনি নেই, তিনি একজন অস্তিত্বহীন নাগরিক —এই অপমান কী করে সহ্য হবে? সামনের রাস্তা দিয়ে পাড়ার লোকেরা কেউ সদম্ভে, কেউ সকৌতুকে, কেউ সোল্লাসে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে যাবে, আর তিনি, নাগরিক তালিকা থেকে বিচ্যুত একজন, নামহীন আত্মার মত নিঃশব্দে ছটফট করবেন।

কিন্তু আজ সকাল থেকেই তিনি অনেকটা শান্ত হয়ে গেছেন। যা হয়ে গেছে তার যে আর কোনও নড়চড় হওয়া সম্ভব নয়, একথা যেন আজই প্রথম বোধগম্য হয়েছে তাঁর। শেষরাত্রের দিকে সামান্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আটটার মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেছে। খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকে উঠে পড়েছেন। কাগজে চোখ বুলিয়েছেন একবার, কিন্তু কমপ্লানের কাপ নিয়ে আজ আর বারান্দায় বসেননি। মীরাকে বলেছেন দরজা জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিতে, তিনি আবার একটু ঘুমোবেন।

মীরা তাই করেছেন। ওপাশে বাবলার ঘরেও এখন মধ্যরাত। একেই সে একটু ঘুমকাতুরে, আজকাল কাজের চাপে সাধ মিটিয়ে ঘুমোতে পারে না। আজ ছুটির দিন, বেলা বারোটার আগে সে বিছানা ছাড়বে না। চুমকি খেয়েদেয়ে যথারীতি টিভিতে নাচাগানা খুলে বসেছে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে অনবরত লোক আসছে যাচ্ছে, ভোট দিতে কিংবা ভোট দিয়ে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, ডাকাডাকি করছে। অপরেশের কানে সেসব পৌঁছচ্ছে না। বরং তাঁর কানে আসছে পাশের ঘরে আস্তে চালানো টিভি থেকে দু চারটে হিন্দী কিংবা ইংরিজি গানের কলি, ঝাপসা ঝাপসা বিজ্ঞাপনের সুর...। অপরেশ আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

মীরা রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাজের মেয়েটা ভোটটোট দিয়ে আদৌ কখন দর্শন দেবে তার ঠিক নেই। আজ ছুটির দিনে বাড়িতে সবাই আছে, মীরা একটু বেশিরকম রান্নার আয়োজন করে বসলেন। অপরেশ নিরামিষ বেশি পছন্দ করেন. নিরামিষ রান্নাতেই বেশি ঝামেলা, কিন্তু মীরা কাল রাতেই ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলেন, বড়া দিয়ে মোচার ঘণ্ট হবে। মোচা কাটা. ডাল বাটা সব একহাতে সামালাতে দেরিও হচ্ছে, হিমসিমও লাগছে। মীরার কোনওদিকে তাকানোর ফুরসৎ নেই।

এর মধ্যে চুমকি একবার 'মা একটু বেরোচ্ছি' বলে বেরিয়ে গেল। মীরা ডালের বড়া ভাজছিলেন, রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন—'কোথায়?' উত্তরে চুমকি কী বলল শোনা গেল না, কড়ায় তখন প্রবল ছ্যাঁকছোঁক শব্দ হচ্ছে। অবশ্য চুমকি কোথায় গেল এ তাঁর জানা। নবনীতা কিংবা ইন্দ্রনীলদের বাড়ি। দুটোই কাছে, হেঁটে গেলে আটদশ মিনিটের রাস্তা।

ঘণ্টা তিনেক পর মীরা যখন রান্নাঘর থেকে বেরোতে পারলেন, ততক্ষণে অপরেশ ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজখানা আরেকবার আগাপাশতলা পড়ে ফেলেছেন। সে কাগজ আপাতত সদাজাগ্রত বাবলার হাতে। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে। মীরা ঘরে এসে অপরেশকে বললেন—'ওঠো. আস্তে আস্তে চানটান করে নাও।' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন,—'চুমকিটা এখনও ফিরল না, কখন চান করবে, খাবেদাবে!'

—'কোথায় বেরলো আবার, ভোটের দিন গণ্ডগোল টণ্ডগোল হতে পারে—' বাবলা অপ্রসন্নমুখে খড়মড় আওয়াজ করে খবরের কাগজ ভাঁজ করতে করতে বলে।

—'কোথায় আর যাবে. বন্ধুর বাড়িটাড়ি গেছে।...পাড়ার মধ্যে আবার গণ্ডগোল কী।'

কিন্তু চুমকি দেড়টাতেও ফিরল না। মীরা অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে একটা ডাইরি আছে, চুমকি আর বাবলার বন্ধুবান্ধবদের ফোন নাম্বার লেখা। সেটা খুলে নবনীতার বাড়িতে ফোন করা হল, চুমকি সেখানে যায়নি, ইন্দ্রনীলের বাড়িতেও না। আরও কিছু সম্ভাব্য জায়গাতেও ফোনে খবর নেওয়া হল। চুমকি কোথাও যায়নি। ভোটের দিন কেউই বাড়ি থেকেও বেরোয়নি যে চুমকির সঙ্গে তাদের দেখা হবে। মীরা ঘরবার করতে শুরু করে দিলেন। অপরেশও উঠে খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আবার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। প্রায় দুটো বাজে, অপরেশের মাথা ঝিমঝিম করছে উদ্বেগে। বাবলা সমানে গজ গজ করে চলেছে —'দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইরেসপনসিব্‌ল্‌ মেয়ে, দ্যাখো গিয়ে কোথায় আড্ডা জমিয়েছে...' মীরা আরেকবার তাঁর ডাইরি খুলে খুঁজতে চেষ্টা করলেন এখনও কাউকে ফোন করা বাকি রয়ে গেছে কিনা—

তখনই দরজার চাবি ঘোরানোর আওয়াজ হল। মীরা ছুটে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন,—হ্যাঁ, চুমকিই. আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে, তার ভঙ্গিমাতে কোনও তাড়া নেই। মীরা চেঁচিয়ে উঠলেন—'হতচ্ছাড়া মেয়ে, কোথায় গিয়েছিলি না বলে, ফেরার

নাম নেই। বাড়িশুদ্ধ লোক চিন্তায় অস্থির—'

চুমকি ঘরে ঢুকল। মায়ের কথার কোনও উত্তর দিল না। বাবলার ক্রুদ্ধ কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে সহজ ভাবে বলল—'তোর চাবিটা নিয়ে গিয়েছিলাম। ...স্যরি, দেরি হয়ে গেল। আমার দোষ নেই, অসম্ভব লম্বা লাইন, আর—'

চুমকির হাবভাব দেখে মীরার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল রাগে। কিন্তু তিনি আবার চিৎকার করার আগেই বাবলাই গর্জে উঠল, —'কোথায় গিয়েছিলি?'

—'ভোটটা দিয়ে এলাম।'

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় সবাই এত স্তম্ভিত হত না। অপরেশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁরই সবার আগে বাক্যস্ফূর্তি হল। প্রতিধ্বনির মত বললেন—'ভোট!'

—'হ্যাঁ, আর ঐ ওদের ক্যাম্পে গিয়ে বলে এলাম আমার মা বাবার নাম কেটে দিয়ে কোনও লাভ হয়নি। আমাদের বাড়ি থেকে তো একটা ভোটই পড়ত। সেইটাই বাবার বদলে আমি দিয়ে গেলাম...' চুমকি অল্প অল্প হাসছে। অপরেশ বিস্ফারিত চোখে বললেন,

—'ওরা কী বলল?'

—'নামকাটার ব্যাপারটা অস্বীকার করল, সে তো করবেই, কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারছিল না, বোঝা যাচ্ছিল ধরা পড়ে গেছে। কথা কাটাকাটি হল একটু, তাতেই আরও দেরি হয়ে গেল।'

অপরেশ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মীরার বুকে হঠাৎ কেমন কান্না ঠেলে উঠছিল। কেবল বাবলা তিক্তস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল— 'গ্রেট! সেইসঙ্গে ভোটার্স আইডেন্টিটিটাও ক্লিয়ার করে এলি। পরের বার তোর নামটাও কিন্তু কাটা যেতে পারে।'

চুমকি খুব নির্বিকার গলায় জবাব দিল—'জানি, সেটা হলে বোধহয় মা বাবার কষ্টটা একটু বুঝতে পারব।'

ছোটদের

দাম্পত্য রহস্য

বাবাই আজ আপিস যেও না। ছোট্ট গুগলি বায়না করে। তার আজ গায়ে জ্বর, নাকে সর্দি, মাথায় ব্যথা। সকাল থেকে সে বিছানা ছাড়তে পারেনি মোটে। তার বাবাই, ইগলুবাবুরও উঠতে তাই দেরি হয়ে গেছে। অন্যদিন ছোট্ট গুগলিই তো ভোর ভোর উঠে পড়ে তাকে ডেকে দেয়, আজকে তো সে পারেনি, তাই। গুগলি বিছানায় পড়ে পড়েই ঘ্যানঘ্যান করেছে, খুঁৎখুঁৎ করেছে, খিটখিট করেছে। আর ইগলুবাবু তাকে সামলাতে সামলাতেই ফ্রিজ থেকে বার করে দুধ খেয়েছেন, ডিমপাঁউরুটি বানিয়ে গুগলিকে খাইয়েছেন, নিজে খেয়েছেন, দাড়ি কেটে চান্ করেছেন—সব একাএকা, নিজেনিজে। এর মধ্যে প্রায় সবগুলিই গুগলি না করে দিলে, অন্তত সবসময় কাছেকাছে না থাকলে তাঁর কিচ্ছু ঠিকঠাক হয় না। আজও হয়নি। নাকাল হতে হতে দেরিও হয়ে গেছে। তবু ইগলুবাবু আপিসের জামাপেন্টুল পরে ছোট্ট গুগলির বিছানায় শিয়রের কাছটিতে পাঁচমিনিট বসেছেন, তার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে আদরও করেছেন, এমন সময় এই বিপত্তি।

ইগলুবাবু বড় মুশকিলে পড়লেন। গুগলির শরীর খারাপ হলে তাঁর আপিস যেতে মন চায় না, কিন্তু আপিসের বড়বাবুরা সেকথায় পাত্তা দেবেন কেন? বিশেষ করে, ছোট্ট গুগলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাটাই যে এখনও পর্যন্ত কেউ জানে না! ইগলুবাবু কাউকে বলেননি, আপিসেও না, আপিসের বাইরেও না। গুগলিও বলেনি কাউকে। কেননা বললেই, সবাই মিলে জোর করে তাদের বড় করে দেবে যে! ছোট্ট গুগলি আর তার বাবাই-বর ইগলুবাবুর এক্ষুনি এক্ষুনি বড় হতে দারুণ আপত্তি, বিষম ভয়!

ইগলুবাবু তাঁর ছোট্ট বউয়ের কপালে একটা হামি খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললেন—কিন্তু ছোনতাই, আপিস না গেলে ইগলুবাবাইকে সবাই বকু করবে যে? আমি খুউব শিগগির শিগগির বাড়ি চলে আসব দেখো....

গুগলি নাক টানলো। সর্দি কিংবা চোখের জল কিছু একটা তবু তার নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সেটা রগড়ে দিতেই তার নাক মুখ উঠল লাল হয়ে, জ্বালাও করতে লাগল খুব। সে বিষম জোরে চোখ বন্ধ করে, ইগলুর ডানকনুই-এর মধ্যে নিজের বাঁ কনুই ঢুকিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—না আ আ আ তুমি কিছুতেই আপিস যাবে না আ আ..তালে কিন্তু আমি ঠিক মরে যাব বলে দিচ্ছি ই ই ই...। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলল তার পা দাপানি।

কাজে কাজেই ইগলুর আর ইশকুল যাওয়া হল না। ইশকুল নয় তো, সে বলে

স্কুল। তো, স্কুল যাওয়া তার প্রায়ই হয় না। অবশ্য সেজন্যে স্কুলের মাস্টারমশাইরাও তাকে বকু করেন না খুব একটা। সে তো খুব ভালো ছেলে, সোনা ছেলে, সে তো পড়া করে রাখে সবসময়, আর খাতাপত্র খুবই গুছিয়ে রাখে বলে তাঁরা বরং ইগলুবেবিকে খুব বেশিই ভালোবাসেন। সে তো দুষ্টু করে না, কক্ষনো, তাই স্কুলে দু-একদিন এমনি এমনি না গেলেও তার কোনও শাস্তি হয় না।

ইগলু স্কুল না গেলে তার ছোনতাই মামমাম তাকে সারাদিন কোলে কোলে রাখে। যদিও সকালবেলা মামমামের জ্বর এসেছিল বলেই স্কুল যাওয়া হয়নি তার, কিন্তু যেই সে স্কুল গেল না, ওম্‌নি মামমামের জ্বর গেল সেরে। আর মামমাম তার ছোট্ট সোনা ইগলুবেবিকে নিয়ে উঠল দারুণ ব্যস্ত হয়ে। তাকে আবার নতুন করে নাওয়ায় ধোওয়ায়— সে তো আজ সব নিজে নিজে করেছে, আর কিচ্ছু পারেনি। পড়াশুনোয় ভালো হলে কী হবে, এসব কাজে সে এক্কেবারে হাবুলগোবুল। মামমাম মগে করে জল ঢেলে ঢেলে তার মুখচোখ গাহাত পা রগড়াতে রগড়াতে বলে—কী চানু করেছিলি হ্যাঁরে, কানের পিঠে সাবানের ফেনা লেগে আছে? মামমাম বকু করে, কিন্তু রাগু রাগু করে নয় মোটেও, মিষ্টি মিষ্টি করে। তারপর ভালো করে নরম তোয়ালেতে গা মুছিয়ে দিয়ে লাল টুকটুকে হাতকাটা গেঞ্জি আর আকাশি রঙের নরম পাজামা পরিয়ে মাথা আঁচড়ে দেয়। ঘাড়ের কাছে চিরুন চালানোর সময় ছোট্ট ইগলুর বড় আহ্লাদ হয়, সে দুধে দাঁত দেখিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসে। আহ্লাদ হলে সে কেবল ঘাড় একাৎ ওকাৎ করে, আর বলে—মাম্‌মাম্‌মাম্ .....। মামমাম তার চিবুক ধরে বলে—আবার হাসো তো বেবি, ছোট্ট সোনা মানিক আমার, দেখি দেখি মুক্তো দেখি?

দুপুরবেলাটায় বেজায় গরম পড়ে এখন। এসময়টাতে দুজনেই তাই একটু ঘুমিয়ে নিল। ফাঁকাফাঁকা বাড়িটায় আর কেউ কোনওদিকে নেই। হাঁসফাঁস গরমে পাখপাখালিও ডাকে না, শুধু মাঝেমাঝে একটানা ঘুঘুর করুণ উদাস ডাক ছাড়া। বাইরে জানলার ধারে টিউবওয়েলে কারা যেন সারাদুপুর ধরে জল তোলে আর চান করে। তাদের আবছা কলকলানি শুনতে শুনতে দুজনেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়। ইগলুবেবি ঘুমোয় তার মামমামের কাছে আর ছোট্ট গুগ্‌লি ঘুমোয় তার বাবাই-এর কাছে।

বিকেলবেলা ওরা বেড়াতে যায়। গড়ের মাঠে গিয়ে বাদামভাজা কিনে খায়। আর কাঠি আইসক্রিম। গুগলির চাই অরেঞ্জ আর ইগলুর পছন্দ পাইনঅ্যাপ্‌ল্। মুখের মধ্যে বরফ পুরে তারা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে খুশিতে হাসে, মাথা নাড়ে, চোখ নাচায়। খানিক পরে গুগলি মুখ থেকে কাঠিটা বের করে বলে—উঃ ঠোঁটদুটো কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে ঠাণ্ডায় হি হি। আবার মুখে পুরে সে মন দিয়ে আইসক্রিম চুষতে থাকে। ইগলুও। মাঝে মাঝে একেকবার ওরা দুজনেই অন্যের আইসক্রিমটাও পরখ করে নেয় জিভ দিয়ে চেটে।

হঠাৎ পশ্চিমদিকে তাকিয়ে ইগলু বলে— ছোনতাই বাড়ি চল্, ঝড় আসছে।

তারপর ঝড় ওদের তাড়া লাগায়। কিন্তু ওরা ছোট্ট হলে কী হবে, বুদ্ধি খুব! ওরা মাটির তল দিয়ে শাঁ করে রেলগাড়ি চেপে একেবারে বাড়ির কাছে চলে আসে। বাড়ির কাছে এসে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ওরা দেখল, ঝড় ওদের জব্দ করতে না পেরে ফিরে গেছে নিজের ডেরায়, রাগের মাথায় চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া জারুল পারুলদের অকারণে। আর তাদের লাল হলুদ বেগুনি গোলাপি চুলের ফিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে সারা রাস্তায়। ঝড়ের বদলে তখন ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল মিষ্টিমতন লাজুক একটা বৃষ্টি।

বৃষ্টি খুব ভালো লাগে ইগলু আর গুগলি দুজনেরই। ওরা লাফায় ঝাঁপায় জল ছিটকায়। ভিজে ভিজে রেস্ হয় দুজনের মধ্যে। কারুরই মনে থাকে না গুগলিসোনার জ্বর এসেছিল, তার বুকেমাথায় এখনও সর্দি। কাজেই বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়েই সে একটা হ্যাঁচ্চো দেয়। তালা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আরও একটা দুটো তিনটে। হ্যাঁচ্চো চলতেই থাকে। ইগলু তাড়াতাড়ি ভিজে জামাকাপড়গুলো ছাড়িয়ে দিয়ে গুগলিসোনাকে শুকনো পোশাক পরিয়ে দেয়। গামাথা মুছে দিয়ে গায়ে বেশ করে একটা চাদর জড়িয়ে দিয়ে তাকে কোলে নিয়ে বসে।

রাত্তিরে দুজনে মিলে খিচুড়ি রাঁধল। সঙ্গে ডিমভাজা। একটাই থালা তাদের, ভাত খাওয়ার। ঐটেতেই কুকার থেকে গরম গরম খিচুড়ি নামিয়ে হাপুসহুপুস করে খেয়ে নিল দুজনে। খেয়েদেয়ে সোজা বিছানায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করছে দুজনেরই। দুজনে দুজনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। দুজনেই চায় যত কাছে যাওয়া যায় তারও চাইতে আরও কাছে যেতে, পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতে। ক্রমে ক্রমে শীত কাটে। শীত কেটে বসন্ত আসে ওদের শরীরে। ডালে ডালে রাঙারাঙা শিমূল পলাশের আগুন জ্বলে, হু হু করে গরম হাওয়া বইতে থাকে নিঃশ্বাসে ...

তখন গুগলি-শিমূল তার ইগলু-পলাশের কানে কানে বলে—আমরা যখন বড় হব, তখন আরও আরও আরও ভালোবাসব, বল্?
